SIMONE DE BEAUVOIR
Homage in commemorating
her birth centenary
by Mahmud Shah Qureshi
price Bdt 150.00
US $ 6.00

AHMED PUBLISHING HOUSE
Bdt 150
ISBN: 984-11-0611-8

সিমন দ্য বোভোয়ার
মাহমুদ শাহ কোরেশী

সিমন দ্য বোভোয়ার

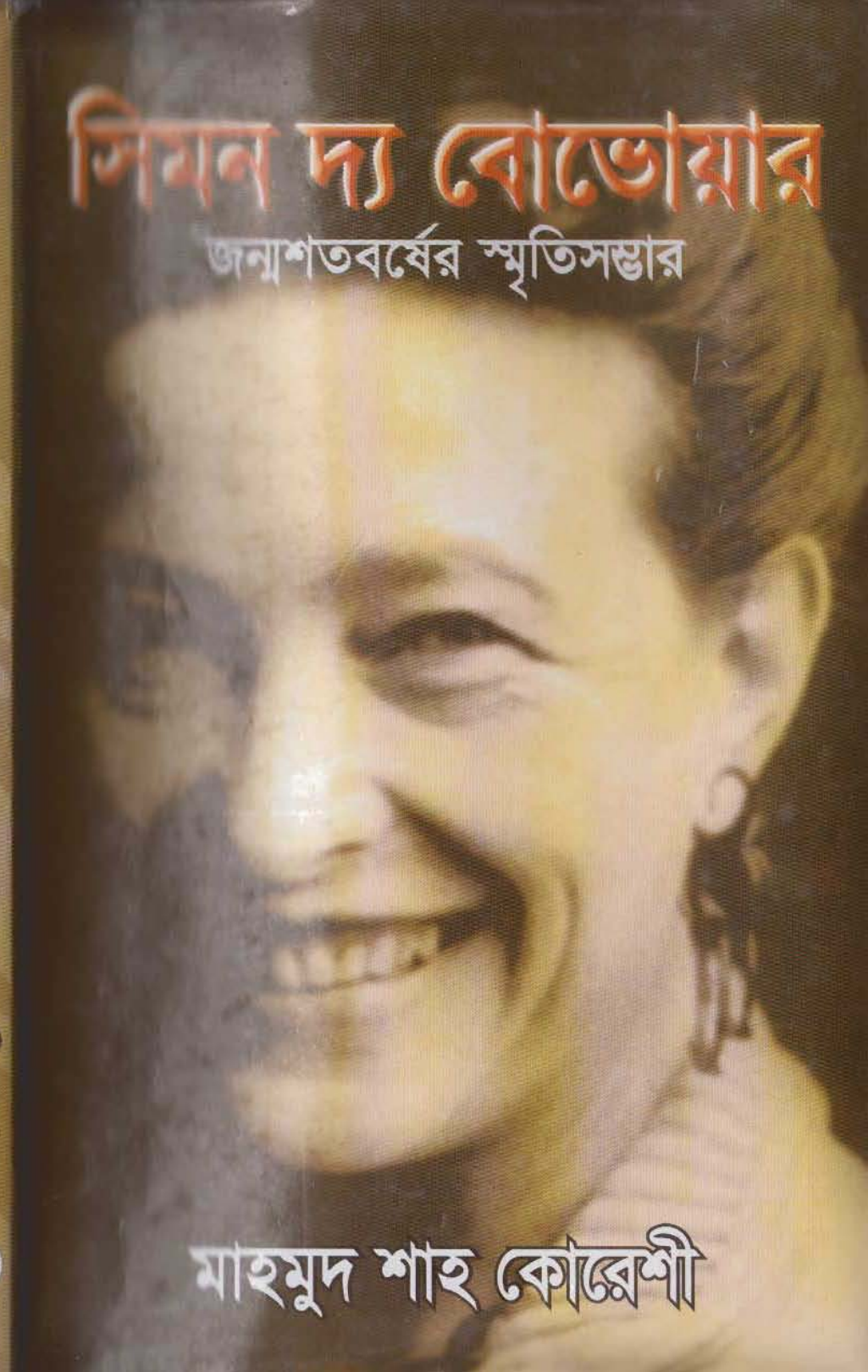

জন্মশতবর্ষের স্মৃতিসম্ভার

মাহমুদ শাহ কোরেশী

সিমন দ্য বোভোয়ার

জন্মশতবর্ষের স্মৃতিসম্ভার

সিমন দ্য বোভোয়ার

জন্মশতবর্ষের স্মৃতিসম্ভার

ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী

আহমদ পাবলিশিং হাউস

প্রকাশক | মেছবাহউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

স্বত্ব | আঁদ্রে মালবো ইনস্টিটিউট অব কালচারের পক্ষে
সৈয়দা কমর জাবীন

প্রকাশকাল | জানুয়ারি ২০০৮
পৌষ ১৪১৪

প্রচ্ছদ | অতনু তিয়াস
যোগসূত্র

বর্ণবিন্যাস | ভাষা-যোগাযোগ ও সংস্কৃতি বিভাগ
গণবিশ্ববিদ্যালয়, সাভার

মুদ্রণ | নিউ সোসাইটি প্রেস
৪৬ জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য | একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

SIMONE DE BEAUVOIR : Jonmoshotoborsher Smritishombhar—*Dr. Mahmud Shah Qureshi*
Published by Ahmed Publishing House, Dhaka-1100. First Edition : January 2008
Price : Tk. 150.00 Only. US $: 5 Only.
ISBN 984-11-0611-8

"কেউ নারী হয়ে জন্ম নেয় না, বরং হয়ে ওঠে নারী"
– সিমন দ্য বোভোয়ার

মরহুম জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানের প্রথম সন্তান,
আমার সুশীলা স্ত্রী নাসরীনের স্নেহময়ী বড় ও একমাত্র বোন,
রন্ধন, সঙ্গীত ও চিত্রকলায় বিশেষভাবে পারদর্শী,
২৬শে মার্চ, ১৯৭১ থেকে ১০ই জানুয়ারি, ১৯৭২ অবধি
মুক্তিযুদ্ধের দুর্গম পথের সহযাত্রী,
সৈয়দা নাজ কমর (জিনাত) ওরফে
বেগম আলী আশরাফ মাসুদ মিয়া

সুচরিতাসু –

১৬ই ডিসেম্বর, ২০০৭

মাহমুদ শাহ কোরেশী

প্রাথমিকী

ঘটনাচক্রে লেখা হয়ে গেল বইটা। বস্তুত, সিমন দ্য বোভোয়ার সম্পর্কে আমার আগ্রহ বহু আগে থেকে। নারী মুক্তির পথিকৃত প্রবন্ধে তা বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে এত কিছু লিখবো কিংবা ভাষান্তরে লিপ্ত হবো তা ভাবিনি কখনো। তাই ঘটনাচক্রে ... ।

তবে বলতেই হয়, শি ডিজার্ভস! কিন্তু আমি তার উপযুক্ত কিনা? প্রশ্ন সেখানে। আমার মনে হয় না। সিমনের ওপর লিখতে গেলে আমাকে কমপক্ষে আরো দু বছর গবেষণা করতে হতো, যেমন সার্ত্রের ওপর কাজ করতে কমপক্ষে তিন-চার বছর প্রয়োজন । তাও প্যারিসে বসে। সে সময় আর এ জীবনে হবে না। এককালে মাল্‌রো নিয়ে আমি বহু বছর কাটিয়েছি – বলতে গেলে ১৯৭১ থেকে আজ অবধি রয়েছে তাঁর প্রতি আমার অব্যাহত আগ্রহ। আর সার্ত্র-সিমন হচ্ছেন তাঁর প্রতিপক্ষ। মধ্যবর্তী এলাকায় রয়েছেন কাম্যু। তিনিও আমার অতি প্রিয় লেখক- দার্শনিক। যাহোক, সিমন দ্য বোভোয়ার ক'দিনের মধ্যে জন্মশতবর্ষে পৌছে যাবেন ভেবে আমি আমার কিছু সময় ও শ্রম কাজে লাগালাম । সমস্যা অনেক। উচ্চারণ ও বানান – ফরাশি থেকে বাংলায় করতে গেলে ঝামেলা রয়েছে বেশ। যেমন, 'সিমন' ঠিক আছে (কিন্তু 'সিমোন' বা 'শিমন' নয়)। 'দ্য' ও চলে । কিন্তু 'বোভোয়ার'-এ একটু সমস্যা রয়েছে। কিন্তু উপায় নেই। 'জঁ-পোল' ঠিক ছিল কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন জাঁ (কিংবা ঝাঁ)-পল ই যথার্থ। 'সাত্র' একেবারেই বেঠিক। হবে 'সার্‌ত্‌র্‌' (অবশ্য ফরাশি 'র' সম্পূর্ণ ভিন্ন ধ্বণি – আলজিহ্বার ব্যাপার। কিন্তু খবর্দার 'খ' নয় এবং কক্ষনো 'সার্ত্রে' নয় যা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়)। অনেক চিন্তা ভাবনার পর বহুল প্রচলিত 'সার্ত্র' বর্ণমালা আমি গ্রহণ করলাম, প্রধানত বর্ণ-সংকোচনের কারণে এবং সুদৃশ্য মনে হওয়াতে।

অনুবাদে গিয়ে আরো বেশী সমস্যা। ফরাশি ধ্যান-ধারণা, নাম, আচার-আচরণ বহু কিছু আমাদের থেকে, এমনকি ইঙ্গ-আমেরিকার ঐতিহ্য থেকেও, ভিন্ন।

বাংলা-ফরাশি/ফরাশি-বাংলা পূর্ণাঙ্গ অভিধান আমাদের নেই। সরাসরি অনুবাদের কর্মোদ্যোগও খুব একটা গড়ে ওঠেনি। "সিমনের ভাষ্যে সার্ত্রের শেষ জীবন" খুব সংক্ষেপে উপস্থাপন করবো ভেবেছিলাম। শেষে দেখলাম, সরাসরি অনুবাদ যেমন অসম্ভব (অন্তত আমার পক্ষে) তেমনি সংক্ষিপ্তসার ও তেমন কাজের কাজ নয়। তাই বর্তমান ব্যবস্থা। কারো পছন্দ হলে শ্রম সার্থক মনে করবো। একই কারণে এবং অপ্রয়োজনীয় ভেবে কিছু অংশ পরিহার করতে হয়েছে – "সাহিত্য কী করতে পারে?" রচনায়। কিন্তু মূল্যবান উক্তি ও বক্তব্য অবিকল অনুবাদের প্রয়াস পেয়েছি।

মোটামুটিভাবে বলতে পারি, বইটি নারী মুক্তির ক্ষেত্রে আগ্রহী ব্যক্তিদের এবং ফরাশি বা সাধারণভাবে সাহিত্যানুরাগী পাঠকের কাজে আসবে।

আমার প্রায় দুষ্পাঠ্য পাণ্ডুলিপি থেকে কম্পিউটার কম্পোজ করে দিয়েছেন আমাদের মৌল ও সামাজিক অনুষদের দুই প্রভাষক আজমীরা বিলকিছ (মনি) ও আতি-উন-নাহার (রত্না)। তাঁদের এবং মেক-আপ প্রুফে একটু হাত লাগানোর জন্য গণমুদ্রণের কাউছার আহমেদ ও রাকিব হোসেনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। মোবারকবাদ জানাই আহমদ পাবলিশিং হাউসের মেছবাহউদ্দিন আহমদ পাশাকে, বইটি সুচারুরূপে প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণের নিমিত্ত। অলমতি বিস্তরেন!

মাহমুদ শাহ কোরেশী

১৬ ই ডিসেম্বর, ২০০৭
গণ বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার

সূচীপত্র

জীবন-তথ্য ❑ ১১

নারীমুক্তির পথিকৃৎ ❑ ১৭

অস্তিত্ববাদের প্রবক্তা : অরুণ মিত্রের বক্তব্য ❑ ২৮

দ্বিতীয় লিঙ্গ প্রসঙ্গ ❑ ৩৩

দ্বিতীয় লিঙ্গের পরে ❑ ৩৮

সাহিত্য কী করতে পারে ? ❑ ৪১

বার্ধক্য ❑ ৫৭

বিদায় সার্ত্র : ১৯৭০-১৯৮০ ❑ ৬৩

চিত্রসূচি ❑ ১২৭-১৩৬

শৈশবে বোনের সঙ্গে

যৌবনে জাজার সঙ্গে

সার্ত্রের সঙ্গে ([illegible], ৩, ৪, ৫, ৬)

নিজের স্টুডিওতে সিমোন

মে, ১৯৬৮ সালে সর্বন ও স্যাঁ জের্মাঁ-র ৪টি আলোকচিত্র

গ্রন্থপঞ্জি

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ

ফ্রান্সের জাতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র ও প্যারিসস্থ ইউনেস্কো হেডকোয়ার্টারের উদ্যোগে প্রকাশিত ফরাশি ভাষায় ২টি গ্রন্থ ছাড়াও ডঃ কোরেশীর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা :

- *সমান্তরাল : বাংলা-ফরাশি কবিতা* (সম্পাদনা ও যুগ্ম-অনুবাদ) চট্টগ্রাম : আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ, ১৯৭৬
- *ঐতিহ্য সংস্কৃতি সাহিত্য* (সম্পাদনা) রাজশাহী : আই.বি.এস. ১৯৭৯
- *CULTURE AND DEVELOPMENT*, Dacca : Obor Book, 1982
- *দার্শনিক দিদ্‌রো ও তাঁর সাহিত্য কীর্তি*, ঢাকা : আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ, ১৯৮৩
- *TRIBAL CULTURES IN BNGLADESH* (ed.), RAJSHAHI : IBS, 1984
- *FESTSCRIFT FOR SYED ALI AHSAN* (Joint ed.), Dacca, 1985
- *অঁদ্রে মাল্‌রো : শতাব্দীর কিংবদন্তী*, ঢাকা : আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ, ১৯৮৬
- *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা : সমস্যা ও সম্ভাবনা* (সম্পাদনা) : রাজশাহী : আই.বি.এস : ১৯৯৮
- *জন্মশতবর্ষের জাক প্রেভের* : ঢাকা : আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ, ১৯৯৮
- *অঁদ্রে মাল্‌রো : জীবনই যার সেরা কীর্তি*, ঢাকা : আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ, ২০০২
- *চট্টগ্রামে অঁদ্রে মাল্‌রো* : ঢাকা, অঁদ্রে মাল্‌রো ইনস্টিটিউট অব কালচার, ২০০৩
- *ALLIANCE FRANÇAISE DE CHITTAGONG: A BRIEF HISTORY WITH PERSONAL NOTE* : Dhaka : André Malraux Institute of Culture, 2004
- *হজ সেরে এসে;* ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০৫
- *মুহাম্মদ ইউনূস : তাঁর স্বপ্ন ও সাফল্য;* ঢাকা; অঁদ্রে মাল্‌রো ইনস্টিটিউট অব কালচার, ২০০৭
- *জহিরউদ্দিন খান স্মারক গ্রন্থ* (সম্পাদনা) ঢাকা; এ.এম.জেড ফাউন্ডেশন, ২০০৭

জীবন-তথ্য

১৯০৮ : ৯ জানুয়ারী সিমন দ্য বোভোয়ার-এর জন্ম প্যারিসে। তখন তাঁর বাবার বয়স ৩০, মায়ের একুশ। বাবা-মা'র প্রথম সন্তান। একমাত্র ছোট বোন আড়াই বছরের বয়োকনিষ্ঠ। বাবা ব্যবহারজীবী, সংশয়বাদী (এগনস্টিক), মা ধার্মিক গৃহবধু।

১৯১৩ : অক্টোবর : সিমন স্কুলে গেলেন। ভীষণ খুশি। শৈশবেই সিমনের চেতনায় নিজের জগতে প্রবেশের ধারণা এসেছিল। ব্যাপারটা তাঁকে ভীষণভাবে উত্তেজিত করেছিল ।

১৯২৯ : শিক্ষক প্রশিক্ষক মহাবিদ্যালয়ের একনিষ্ঠ ছাত্রী। সহপাঠী অদ্রেঁ এরবোর সঙ্গে বন্ধুত্ব। লাটিন কোয়ার্টারের লুকসমবুর্গ বাগানে বসে সিমন ইসাডোরা ডানকানের *আমার জীবনী* পাঠ করছেন এবং ভাবছেন নানা কিছু। এরবো তাঁর কাছে সার্ত্রের আঁকা একটা ছবি নিয়ে এলেন যা সিমনকেই উৎসর্গীকৃত। সার্ত্র ও নিজান-এর সঙ্গে সিমন লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, এরবো ফেল। আশৈশব বান্ধবী জাজার মৃত্যু ।

১৯৩০ : সিমনের শিক্ষকতা কর্মের সূত্রপাত। সার্ত্র চললেন মিলিটারী সার্ভিসে, নভেম্বরে ।

১৯৩১ : সার্ত্র লা আভ্‌র বন্দরে, সিমন মার্সেই বন্দরে নিয়োগপ্রাপ্ত, গ্রীষ্মাবকাশে স্পেন সফর।

১৯৩২ : উপন্যাস রচনার চেষ্টা। গ্রীষ্মে আবার স্পেন গমন। রুআঁ-তে বদলী। সার্ত্র 'জর্মন ফেনমনলজি' অধ্যয়নে নিমজ্জিত।

১৯৩৩ : ইস্টারে লন্ডন। সার্ত্রের সঙ্গে দুবার ঝগড়া। নতুন করে উপন্যাস লেখার প্রয়াস। সার্ত্রের বার্লিন যাত্রা।

১৯৩৫ : ফেব্রুয়ারিতে বার্লিন সফর। ফকনার ও কাফকা অধ্যয়ন। জুন শেষে সার্ত্রের সঙ্গে দ্বিতীয়বার জর্মনী সফর এবং কর্সিকা-য় ছুটির শেষ পর্যায় কাটানো। ছুটির পর ইতিহাস ও হুসের্ল-এর দর্শন অধ্যয়ন। কিছু গল্প ও কথিকা রচনা।

১৯৩৬ : ত্রিভূজ প্রেমের সূত্রপাত (অলগা, সার্ত্র ও সিমন)। সার্ত্রের ছাত্র জাক্ বোস্ত-এর সঙ্গে পরিচয়। গ্রীষ্ম : ইতালী সফর। প্যারিসের মলিয়ের মহাবিদ্যালয়ে (লিসে=মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক) অধ্যাপনার জন্য বদলী। আড্ডার অবস্থান : মোঁপারনাসের লা দোম (কাফে-রেস্তোরাঁ)। সার্ত্রের উপন্যাস *মেলাংকলিয়া* প্রত্যাখ্যাত, পরে এটি পরিমার্জিত হয়ে *লা নোজে* (বিবমিষা)-রূপে বিখ্যাত।

১৯৩৮ : সিমনের *প্রিমোতে দ্যু স্পিরিতুয়েল* গালিমার এবং গ্রাসে-দুই প্রকাশক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত। গ্রীষ্মে-মরক্কো সফর। অক্টোবর থেকে উপন্যাস *ল্যাঁভিতে* (শি কেইম টু স্টে/নিমন্ত্রিতা) রচনা শুরু।

১৯৩৯ : ১লা সেপ্টেম্বর, যুদ্ধ শুরু; সার্ত্রকে যেতে হল যুদ্ধে। সিমনের ভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে বদলী।

১৯৪০ সার্ত্র যুদ্ধবন্দী। নিজানের মৃত্যু।

১৯৪১ : সার্ত্রের প্যারিস প্রত্যাবর্তন "সমাজতন্ত্র ও স্বাধীনতা" নামে সার্ত্র, সিমন, বোস্ত, মের্লো-পঁতি প্রমুখ মিলে একটি প্রতিরোধী সংগঠন প্রতিষ্ঠা। শিল্পী জিয়াকোমেতির সঙ্গে প্যারিসে পরিচয়। জুলাই : সিমনের পিতার মৃত্যু।

১৯৪২ : সিমনের উপন্যাসের প্রকাশক জুটল।

১৯৪৩ : সার্ত্রের জাতীয় লেখক কেন্দ্রে প্রবেশ এবং *লেৎর ফ্রঁসেজ*-এর সম্পাদকমন্ডলীতে যোগদান। সিমনের "অন্যদের রক্ত" উপন্যাসের রচনা শেষ। দার্শনিক জঁ গ্রনিয়ের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি গ্রন্থ রচনা যা জুলাই মাসে গালিমার কর্তৃক প্রকাশিত। তৃতীয় উপন্যাস "মানুষ মরণশীল" রচনা। প্রথম উপন্যাস *ল্যাঁভিতে* প্রকাশিত; সমালোচকরা উচ্ছ্বসিত। আলবের কাম্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

১৯৪৪ : মিশেল লেয়রিস্-এর বাড়িতে পিকাসোর লেখা একটি নাটক পাঠে সিমন আমন্ত্রিত। ক'জন প্রখ্যাত শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ । সালাক্রু, বাতাই, লাকঁ, ব্রাক, পিকাসো ও অন্যান্যরা। এপ্রিল-জুলাই; "অপ্রয়োজনীয় মুখসমূহ" রচনায়। অগাস্ট-সার্ত্রের সঙ্গে মুক্ত প্যারিসে প্রমনাদ (ঘুরে বেড়ানো)। হেমন্ত – গালিমার তাঁর *পিরুস এ সিনেয়াস* প্রকাশ। কাম্যুর সঙ্গে বন্ধুত্ব। *লে তঁ মদেরন* ("আধুনিক সময়") সাময়িকী প্রকাশের সময় *কোঁবা* (সংগ্রাম) কাগজে ব্যস্ততার জন্য কাম্যু যোগ দিতে পারলেন না। মাল্‌রো যোগ দানে অস্বীকৃত। সম্পাদক মন্ডলীতে থাকলেন-আরোঁ, লেয়রিস, মের্লো-পঁতি, আলবের আলভিয়ে, পোলঁ, সার্ত্র ও সিমন।

১৯৪৬ : উত্তর আফ্রিকা সফর-তিউনেশিয়, আলজেরিয়া, প্যারিসে প্রত্যাবর্তন : কেনো-র মাধ্যমে বরিস ভিয়ঁ-র সঙ্গে সাক্ষাৎ। *পুর য়্যুন মরাল দ্য লঁবিগুইতে* দর্শন গ্রন্থের রচনা শুরু ।

মে : সার্ত্রের সঙ্গে বক্তৃতাদানের জন্য সুইজারল্যান্ডে গমন। জঁ কো সার্ত্রের সচিব নিয়োজিত। 'আধুনিক সময়' সম্পাদক মন্ডলীতে পরিবর্তন।

ইতালী প্রসঙ্গ :

অক্টোবর : কোয়েস্টলার-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ। বরিস ভিয়ঁর বাড়িতে সান্ধ্য অনুষ্ঠান। কাম্যুর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ। "মানুষ মরণশীল" উপন্যাস প্রকাশিত।

১৯৪৭ : মে : আমেরিকা সফর। লেখক নেলসন আলগ্রেন-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ। সার্ত্রের সঙ্গে সুইডেন যাত্রা। সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয়বার মার্কিন মুলুক গমন। "আধুনিক সময়" শীর্ষক বেতার অনুষ্ঠান শুরু কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পর বন্ধ।

রেয়মো আরোঁ এবং আর্থার কোয়েস্টলার এর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ।

১৯৪৮ : নেলসনের সঙ্গে মার্কিন ভ্রমণ। "আমেরিকা- দিনের পর দিন" প্রকাশ। সার্ত্রের সঙ্গে আলজেরিয়া ভ্রমণ। নারীর অবস্থান সম্পর্কে রচনা প্রকাশ।

১৯৪৯ : সিমন ও সার্ত্র ক্রাবচেংকোরি বিচার অনুষ্ঠান দর্শন। "দ্বিতীয় লিঙ্গ" গ্রন্থ প্রকাশ। আলগ্রেন-এর প্যারিস আগমন। তাঁর সঙ্গে সিমনের রোম, নেপল্‌স, তিউনেশিয়া, আলজেরিয়া ও মরক্কো ভ্রমণ । শীতে – সার্ত্রসহ লেখার জন্য অবস্থান।

১৯৫০ : সার্ত্রের সঙ্গে কালো আফ্রিকা ভ্রমণ। আলগ্রেনের খোঁজে আমেরিকা ভ্রমণ। সঙ্গীত শ্রবণের জন্য রেকর্ড প্লেয়ার ক্রয় । একটি টিউমার অপারেশন।

১৯৫১ : লেখিকা কলেৎ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ। সার্ত্রের সঙ্গে নরওয়ে। আইসল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড ও লন্ডন ভ্রমণ। আলগ্রেন- এর সঙ্গে অক্টোবরে মিসিগান ভ্রমণ। একটা মোটরগাড়ি ক্রয় ।

১৯৫২ : গ্রীষ্মের শুরুতে সার্ত্র-কাম্যু ঝগড়া এবং কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে সৌহার্দ্য। সিমন শেষ করলেন *লে মদাঁর‍্যাঁ* উপন্যাস। বোস্ত-এর বাড়িতে ক্লোদ লঁজমানের সঙ্গে পরিচয়। সার্ত্রের সঙ্গে ইতালী ভ্রমণ। লঁজমানের সঙ্গে ডিসেম্বরে কয়েকদিন হল্যান্ড সফর।

১৯৫৪ : সার্ত্র মস্কো গেলেন মে মাসে। হাইপার টেনশনের জন্য হাসপাতালে। লঁজমানের সঙ্গে স্পেনে। সার্ত্রের সঙ্গে অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ায়। অক্টোবরে লে মঁদার‍্যাঁ (দা ম্যান্ডারিন) প্রকাশিত ও 'গোঁকুর' পুরস্কার প্রাপ্ত। এক মাসে চল্লিশ হাজার কপি বিক্রি।

১৯৫৫ : সার্ত্রের সঙ্গে হেলসিংকিতে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে অংশগ্রহণ। লঁজমানের সঙ্গে স্পেন সফর । হেমন্তে সার্ত্রের সঙ্গে চীন ভ্রমণ। *প্রিভিলেজ* প্রকাশ, (গালিমার)।

১৯৫৬ : চীনের ওপর গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ। সার্ত্র, লঁজমান ও মিশেল ভিয়ঁসহ ইতালী ও যুগোশ্লাভিয়া ভ্রমণ। সার্ত্রের সঙ্গে রোম। হাঙ্গেরীর বিপ্লব। রুশ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে লেখকদের প্রতিবাদ লিপিতে সিমন ও সার্ত্রের স্বাক্ষর।

১৯৫৮ : মার্চে আত্মজীবনী প্রথম খন্ড প্রকাশের জন্য গালিমারকে প্রদান। গ্রীষ্মে সার্ত্রের সঙ্গে রোম। দ্য গোল বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ। সার্ত্রের স্বাস্থ্যাবনতি।

১৯৬০ : সড়ক দুর্ঘটনায় কাম্যুর মৃত্যু। ফেব্রুয়ারি : কার্লোস ফ্রংকির আমন্ত্রণে সার্ত্রের সঙ্গে কিউবা গমন। ন্যুইয়র্কে স্বল্পকালীন অবস্থান।মার্চ : নেলসন আলগ্রেন প্যারিসে। তাঁর সঙ্গে স্পেন ভ্রমণ। পরিবার পরিকল্পনা ও ভালবাসা বড় ভয় শীর্ষক দুটি গ্রন্থে ভূমিকা লেখা।

মে'র শেষে এডভোকেট জিজেল হালিমির অনুরোধে আলজেরিয়ার অগ্নিকন্যা জামিলা ব্যুপাশার ওপর অমানবিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে *ল্য মোঁদ* পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ। ফরাশিরা যাতে আলজেরিয়া যুদ্ধ বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে সেজন্য ১২১ জন বুদ্ধিজীবীর প্রতিবাদ লিপি। আলগ্রেনের সঙ্গে ইস্তানবুল, এথেন্স, ভ্রমণ। মধ্য-আগস্টে সার্ত্রের সঙ্গে দুমাসের জন্য ব্রেজিল সফর, নভেম্বরে আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খন্ড "বয়সের চাপ" প্রকাশিত। লেখিকা *ক্রিস্তিয়ান রশফর*-এর সাথে সাক্ষাৎ।

১৯৬১ : মের্লো-পঁতির মৃত্যু। গ্রীষ্মে রোম । ফ্রঁজ ফানোঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ। ১লা নভেম্বর সার্ত্রের সঙ্গে আলজেরিয়ার পক্ষে আন্দোলনে অংশগ্রহণ। জামিলা ব্যুপাশার ওপর লেখা জিজেল হালিমির বইয়ের ভূমিকা রচনা। ফানোঁর মৃত্যু।

১৯৬৩ : রাশিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় ভ্রমণ। আত্মজীবনী তৃতীয় খন্ড "অবস্থার চাপ" প্রকাশিত। মায়ের মৃত্যু। এ সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা 'অতি কোমল এক মৃত্যু'।

১৯৬৬ : রাশিয়া ভ্রমণ। সার্ত্রের সঙ্গে জাপান সফর (সেপ্টেম্বর)। *লে বেল্ ইমাজ* শীর্ষক উপন্যাস প্রকাশিত।

১৯৬৭ : ফেব্রুয়ারী-মার্চ আল্ পত্রিকার সম্পাদক, নাসেরের প্রতি বিশ্বস্ত, হাসনাযেন হায়কাল কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে সিমন, সার্ত্র ও লঁজমানের মিশর সফর । পরে ইস্রায়েল গমন । জুনে ৬ দিনের যুদ্ধ। মে মাসে স্টকহোমে সার্ত্র ও সিমনের (বারট্র্যান্ড) রাসেল ট্রাইবুনালে অংশগ্রহণ। এর দায়িত্ব ছিল ভিয়েৎনামে মার্কিনীদের যুদ্ধাপরাধের পরিমাণ নির্ণয়। সোভিয়েত লেখক সংঘের সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান ।

১৯৬৮ : *লা ফাম রঁপ্যু* শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশ। মে '৬৮। ফ্রান্সে ছাত্র ও শ্রমিকদের বিদ্রোহ। নভেম্বর : সার্ত্রের সঙ্গে প্রাগ সফর। সেখানে সার্ত্রের দুটি নাটকের অভিনয় হচ্ছিল । সোভিয়েত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সার্ত্রের বিবৃতি প্রদান।

১৯৭০ : "বার্ধক্য" গ্রন্থের প্রকাশ (জানুয়ারি)। মাওবাদীদের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ। নারী অধিকার সম্পর্কিত কয়েকটি আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদান।

১৯৭২ : *তু কোঁৎ দ্য* (সব হিসাব-নিকাশের পর) গ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৭৮ : অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত।

১৯৮০ সার্ত্রের মৃত্যু।

১৯৮১ : *লা সেরেমনি দেজাদিয়্য সুইভি দ্য অঁপ্রতিয়্যাঁ আভেক জঁ- পল-সার্ত্র উ সেপ্তঁব্র ১৯৭৪* গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৮৬ : ১৪ ই এপ্রিল ৭৮ বছর বয়সে সিমনের মৃত্যু। প্যারিসের মোঁপারনাস কবরস্থানে সার্ত্রের পাশে শায়িত তাঁর মরদেহ। তাঁর আঙুলে নেলসন আলগ্রেন প্রদত্ত আংটি সহ তিনি কবরস্থ।

নারীমুক্তির পথিকৃত

আমাদের দেশে সার্ত্র-সিমন প্রসঙ্গ এখনো আলোচিত হয়। বিশেষত সার্ত্র। অথচ সিমনই বেশি প্রাসঙ্গিক, নারীবাদী ঢেউয়ের কারণে। নামটি অবশ্য উচ্চারিত হয়, কখনো উদ্ধৃতিও দেখি তাঁর নানা লেখা থেকে, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে বা তাঁর গ্রন্থাদি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা সম্ভবত কেউ করেননি, অন্তত আমার চোখে পড়েনি। বিষয়টিতে বহু আগে আমার কিছু আগ্রহ জন্মেছিল। কিন্তু নানা কারণে এতকাল সিমন দ্য বোভোয়ারকে নিয়ে কিছু লেখা সম্ভব হয়নি।

১৯৬০-এর গ্রীষ্মকালে আমি ছ'সপ্তাহের জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একসিটার কলেজের বাশিন্দা-ছাত্র ছিলাম। আমাকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল এমন এক ছাত্রের কক্ষে যার একটা সুন্দর গ্রন্থ-সংগ্রহ ছিল। সেখানে সিমন দ্য বোভোয়ার-এর 'দ্বিতীয় লিঙ্গ'- ইংরেজি অনুবাদে *দা সেকেন্ড সেক্স*-বইটি পাই এবং আদ্যোপান্ত পড়ে আমি বিমোহিত হয়েছিলাম। আমার মনে হল, এই গ্রন্থের জন্য তো তিনি ডক্টরেট পেতে পারতেন। অবশ্য তাঁর যে 'আগ্রেজে' ডিগ্রী আছে, সেটা ফ্রান্সে অনেক গৌরবমন্ডিত। সে সময়ে আমার কাছে সেটাকে মনে হতো আমাদের দেশের এম.এ + এম.এড্ + সি.এস.এস! ফ্রান্সে সেটি অতি কষ্টে পেয়ে একজন শুধুমাত্র উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষক হতেন। তবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের আরো অনেক কিছু হবার সম্ভাবনা থাকত। সার্ত্র, সিমন, কাম্যু, আরোঁ, পোঁপিদু, জিসকার দেস্ত্যাঁ প্রমুখ অনেকেই এই ডিগ্রীধারী। শেষের দু'জন যে মন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন সেটা বহুজনবিদিত।

সাতচল্লিশ বছর পূর্বের সেই গ্রন্থপাঠের অভিজ্ঞতা নিয়ে সিমনের দিকে দৃষ্টি রেখেছি। কিন্তু ভাঁকে ছবিতে, টিভিতে ছাড়া প্রত্যক্ষ করিনি। সার্ত্রকে দু'দুবার মোটামুটি কাছ থেকে দেখেছি ও তাঁর বক্তৃতা শুনেছি। সিমনের লেখা, তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য, সমালোচনা, বিশেষ করে তাঁর আত্মজীবনীর তিন খন্ড পড়েছি। এবং আশির দশক পর্যন্ত চলেছে এভাবে। তবে তাঁর প্রতিভার দ্যুতির স্মরণ আমাকে সর্বমুহূর্তে মোহিত করেছে।

পুরো বিংশ শতাব্দীর দিকে তাকিয়ে ব্যক্তিগতভাবে ফ্রান্সের অঁদ্রে মাল্‌রোকে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বরূপে গ্রহণ করলেও কাম্যু-কে অতি প্রিয় লেখক এবং সিমন দ্য বোভোয়ারকে সবচে' অন্তর্ভেদী লেখিকারূপে স্থান দিয়েছি। আমাদের দেশের মহিলাদের মধ্যে যাঁরা বর্তমানে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের অনেকেই হয়তো আমার এই 'লেখিকা' অভিধা গ্রহণ করতে চাইবেন না। কিন্তু আমার কাছে এক অদম্য স্বাধীন সত্তার মহিলারূপে সিমন উদ্ভাসিত হলেও তাঁকে আমি একজন 'লেখিকা' রূপেই চিহ্নিত করবো। কারণ তাঁর জীবনাভিজ্ঞতা ও তার প্রকাশের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়েছে এর তাৎপর্য এবং সেখানেই এক পর্যায়ে দেখা যাবে, 'পুরুষ-রমনী কোনো ভেদাভেদ নাই'।

বর্তমান নিবন্ধে সিমনের সার্বিক পরিচিতি তুলে ধরা সম্ভব নয়। বছর দুয়েক আগে সপ্তাহব্যাপী প্যারিস অবস্থানকালে আচমকা তাঁর লেখা 'বার্ধক্য' শীর্ষক সমাজ-গবেষণা মূলক একটি গ্রন্থ আমার দৃষ্টিগোচর হল। সুলভে বইটি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে কিনে ফেললাম। এরপর ফ্রান্সে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র বন্ধু সমিতির সভাপতি লুসিয়্যাঁ বিগো আমার কাছে তাঁর 'বিদায় সার্ত্র' গ্রন্থটি পাঠালেন। এ-এক অসামান্য উপহার! সুদীর্ঘকাল যাবত সার্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কের শেষের দিনগুলোর বর্ণনাসমৃদ্ধ গ্রন্থটি আমি পড়তে চেয়েছিলাম। তাছাড়া নিজের দেশেই পেয়ে গেলাম তাঁর 'দ্বিতীয় লিঙ্গ', বইটির ইংরেজি অনুবাদ খুবই সস্তায়, সম্ভবত 'পাইরেট এডিশন' বিধায়।

সুতরাং বই দুটো ছাড়াও অন্য সূত্রে পাওয়া তথ্যাদি নিয়ে শুরু করা যেতে পারে আমাদের বর্তমান আলোচনা।

বিশ্বখ্যাত লেখকদের সাক্ষাৎকারের জন্য প্রসিদ্ধ *দা প্যারিস রিভিউ* বসন্ত-গ্রীষ্ম ১৯৬৫ ভল্যুম ৯-এর ৩৪ সংখ্যায় সিমন দ্য বোভোয়ারও রয়েছেন, ২৩ থেকে ৪০ পৃষ্ঠায়। সাহিত্যানুরাগী সাংবাদিক মাদলেন গবেই-কে তিনি জঁ জনে ও জঁ -পল সার্ত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন – সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য। কিন্তু নিজের বেলায় ছিল তাঁর সংকোচ : 'আমার তিনটি স্মৃতিকথা কি যথেষ্ট নয়'? অবশেষে দীর্ঘ না-করার শর্তে রাজী হলেন; তাঁর মোঁপারনাসের ছোট্ট, রৌদ্রোজ্জ্বল এপার্টমেন্টের একই সাথে পড়বার ও বসবার ঘরেই তাঁরা দুজন কথাবার্তা বলেছেন। বই-ভর্তি শেলফ। তবে অনেক আজে বাজে বই। সিমনের বক্তব্য, 'সেরা বই গুলো সব আমার বন্ধুদের হাতে। তাই ওগুলো আর ফিরে আসে না।' টেবিলগুলোতে বিদেশ ভ্রমণের সময় সংগৃহীত রঙচঙে জিনিসপত্র। তাতে একমাত্র মূল্যবান সামগ্রী – তাঁকে উপহার প্রদত্ত জিয়াকোমেত্তির একটি ভাস্কর্য। অনেকগুলো গানের রেকর্ড ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তাঁর সম্ভ্রান্ত চেহারায় বিচ্ছুরিত তাজা গোলাপী আভা, নীল চোখ, প্রসন্ন হাসিমুখ। সৌহার্দ্যময় আচরণে তাঁকে অতিমাত্রায় কমবয়সী ও জীবন্ত দেখাচ্ছিল।

সাক্ষাৎকার-পাঠে আমরা জানলাম সিমন আবাল্য ইংরেজি সাহিত্য পড়তে ভালোবাসেন। যতো ভালো পড়তে পারেন ততো বলতে পারেন না। ভার্জিনিয়া উলফের প্রতি তাঁর রয়েছে প্রবল আগ্রহ। কলেৎ-এর সীমাবদ্ধতা তাঁর অপছন্দ, উচ্চশিক্ষায় তিনি যে একাডেমিক মেথড শিখতে পেরেছিলেন তা তাঁর 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' লেখার ক্ষেত্রে কাজে লেগেছিল। তিনি নিজেকে একজন ভালো শিক্ষক মনে করেন না। কারণ তিনি শুধু চার-পাঁচজন নির্বাচিত ছাত্রের প্রতি আগ্রহ নিতেন। তাঁর মতে, ভালো শিক্ষকদের সবার প্রতি সমান আগ্রহ থাকতে হবে। কিন্তু দর্শন পড়াতে

যেয়ে তিনি শুধু চার-পাঁচজনকেই ক্লাসে আলোচনায় অংশ নিতে দেখেছেন। দশ বছর ধরে লিখে ছত্রিশ বছর বয়সে তিনি প্রকাশিত হয়েছেন। অবশ্য সার্ত্রও আত্মপ্রকাশ করেছেন পঁয়ত্রিশে ('বিবমিষা', 'দেয়াল')। স্তঁধালও লেখা শুরু করেছিলেন চল্লিশে। সিমনের *L'invitee (She came to Stay/* 'নিমন্ত্রিতা') উপন্যাসে হেমিংওয়ের প্রভাব আছে এবং তাঁর মতে, সেটি শুধু সহজ সংলাপ রচনায় ও ছোটখাট বস্তুর গুরুত্ব প্রদর্শনে সীমাবদ্ধ।

সকালে চা খেয়ে ১০টা থেকে লেখা শুরু করেন সিমন এবং তা চলে ১টা অবধি। এরপর বন্ধু-সন্দর্শনে বেরিয়ে পড়া। আবার ৫টায় বসে রাত ৯টা পর্যন্ত কাজ। তাতেই তাঁর আনন্দ। এবং এটা রীতিমতো বাঁধাধরা। সার্ত্রের সঙ্গে প্রায়ই মধ্যাহ্নভোজনে মিলিত হন তিনি। সাধারণত তাঁদের এই আহারপর্ব চলে লে দ্যো মাগো ও কাফে দ্য ফ্ল্যর রেস্তোরঁয়। তাছাড়া বিকেলে অনেক সময় তাঁর ঘরেই কাজে বসে পড়েন। সার্ত্রের স্যাঁ-জের ম্যাঁ-দে-প্রে-র বাসা খুবই কাছে। ৫ মিনিটের হাঁটা পথ।

বছরে দু- তিন মাস ভ্রমণে কাটান। যেসব বই পড়া বাকী তা তখনই পড়েন।

সিমনের লেখা 'অন্যদের রক্ত' বা 'সব মানুষ মরণশীল' – এই দুই উপন্যাসে যে-সময়ের সমস্যা নিয়ে বক্তব্য তা তাঁর নিজস্ব ধ্যানধারণা থেকে উদ্ভুত। জয়েস কিংবা ফকনার থেকে ধার করা নয়। 'সময় যে বহিয়া যায়' – সে সম্পর্কে তিনি সবসময় সচেতন। তাঁর মনে হতো যে তিনি যেন বুড়িয়ে গেছেন। বার বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁর ধারণা; উত্তর ত্রিশ বয়স একটা দুঃসহ ব্যাপার। একদিকে কিছু একটা হারিয়ে গেল অন্যদিকে একই সময়ে কিছু যেন পাওয়া গেল, 'জীবন আমাকে অনেক কিছু শিখিয়ে গেল'। তবুও 'সময় বহিয়া যাওয়ার' ব্যাপারটা বারবার তাঁর মনে উদয় হতো। কেননা সন্নিকট ভাবতেন মৃত্যুকে যার সঙ্গে রয়েছে ধ্বংস হয়ে যাবার দুর্ভাবনা। আসলে সব কিছু বিখন্ডিত হবে, প্রেমও নিঃশেষিত হয়ে

পড়বে। অবশ্য তাঁর জীবনে চলমানতার অভাব ঘটেনি – এক প্যারিসেই কেটেছে সারাটি জীবন, প্রায় একই জায়গায়। সার্ত্রের সঙ্গে রয়েছে সুদীর্ঘকালের সম্পর্ক। খুবই পুরনো বন্ধু রয়েছে অনেক যাঁদের সঙ্গে ঘটে নিয়মিত সাক্ষাৎ।

সার্ত্রের সঙ্গে তাঁর চিন্তার পার্থক্য হচ্ছে – সার্ত্র মনে করেন তিনি অমরত্বের অধিকারী কেননা তাঁর সৃষ্টিকর্ম বেঁচে থাকবে। আর সিমন সব কিছুর বিলয় যে ঘটবে এই তত্ত্বে বিশ্বাসী। সার্ত্রের ধারণা শব্দের মধ্যে জীবনকে পুরে রাখা যাবে। 'আর, সিমনের বক্তব্য, আমি সবসময় ভেবেছি শব্দ জীবন নয় বরং জীবনের প্রতিচ্ছবি, বলা চলে মৃত্যুরও'।

বাস্তবের ভিত্তিতে লেখা তৈরী না হলে ,এবং কিছুটা সীমা লংঘনকারী – যেমন আলেকসঁদ্র দ্যুমা বা ভিক্তর উগোর রচনা – তাতে সিমনের আগ্রহ নেই। টলস্টয়ের *ওয়ার এন্ড পীস*-এ যেমন যথার্থ জীবন থেকে চরিত্র নেওয়া হয়েছে, তিনিও তাই করেছেন। 'কোনো বিশেষ চরিত্রের চাইতে চরিত্র সমূহের পারস্পরিক সম্পর্কে, প্রেমের বা বন্ধুত্বের সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ সমধিক' – বলেছেন সমালোচক ক্লোদ্ রোয়া।

সিমনের অনেক উপন্যাসে অন্তত একটি নারী চরিত্র পাওয়া যায়, যে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে চলে বা উন্মাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে। সিমনের মতে, প্রেম হল এক অসামান্য অধিকার। সত্যিকার প্রেম যা খুবই দুর্লভ, নারী/পুরুষের জীবনকে সম্পদশালী করে থাকে। মেয়েরা বেশী ফলাফল ভোগ করে কারণ 'প্রেমে মেয়েদের আত্মদান অনেক বেশী। গভীর সমবেদনা প্রকাশের ক্ষেত্রেও তারা অধিকতর সংবেদনশীল'। কিন্তু যে স্বাধীন ও মুক্ত মানবী – 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' গ্রন্থে সিমনের মূল প্রতিপাদ্য সে চরিত্র তাঁর উপন্যাসে খুব বেশী প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাঁর জবাব; 'আমি মেয়েদের দেখিয়েছি যেমন ওরা আছে তেমন অর্থাৎ খন্ডিত মানবসত্ত্বারূপে। যেমন হওয়া উচিত তেমন নয় --- পুরুষের চেয়ে

মেয়েদের চরিত্র অংকন আমার কাছে সহজতর। সেজন্য নারী চরিত্রগুলো অনেক উন্নত'।

'দা মান্ডারিন' উপন্যাস লেখার পর দীর্ঘদিন ধরে তিনি স্মৃতিকথা রচনায় আত্মমগ্ন ছিলেন। তাঁর কাছে দুটোই পছন্দ। দুটোই দুই ধরনের পরিতৃপ্তি ও হতাশা আনে। স্মৃতিকথার সুবিধা হল, বাস্তবতার ভিত্তিটা সেখানে সহজলভ্য। তবে উপন্যাসে অন্য ধরনের সুবিধা রয়েছে। --- তাঁর মতে কাহিনী বানানোর চাইতে আবিষ্কারই লক্ষ্য হওয়া উচিত। শৈশব ও যৌবন নিয়ে তিনি লিখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কথা-সাহিত্যে সেটি সম্ভব হয়নি। এটা ছিল খুবই আবেগাশ্রিত এক ব্যক্তিগত প্রয়োজন। কিন্তু *লে মেমোয়ার দ্যুন জ্যন ফিই রঁজে* (*দা মেমোয়ারস অব অ্যা ডিউটিফুল ডটার*/কোনো এক লক্ষীমেয়ের স্মৃতিকথা) লিখে তিনি নিজেই হতাশ হয়েছিলেন। তখন তাঁর মনে হয়েছিল, "আমি স্বাধীন হবার জন্য যুদ্ধ করেছি, আমার স্বাধীনতা নিয়ে কী করেছি? তার কী পরিণাম ঘটলো"? তখন তার উত্তরভাগস্বরূপ লিখলেন, একুশ বছর বয়স থেকে বর্তমান সময় অবধি 'জীবনের পূর্ণ বিকাশ' এবং 'পরিস্থিতির চাপ' তাঁর আত্মজীবনীর দ্বিতীয় অংশটিকে ইতালীর বিখ্যাত লেখক কার্লো লেভি অভিহিত করেছেন "শতাব্দীর মহান প্রেমের উপাখ্যান" বলে। এই গ্রন্থে কিংবদন্তীর সার্ত্রকে যথার্থ মানুষরূপে চিত্রিত করেছেন সিমন। ইচ্ছাকৃতভাবেই তিনি তা করেছেন। সার্ত্র চাননি যে সিমন তাঁর সম্পর্কে লিখুন। কিন্তু যেভাবে সিমন তাঁর কথা লিখেছিলেন, তা দেখে সার্ত্র আর তাঁর লেখায় বাধা দেননি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ ভাগ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ছিল অস্তিত্ববাদের সমৃদ্ধির সময়। আর এই সাক্ষাৎকারের সময় অর্থাৎ ১৯৬৫ সালে নব্য উপন্যাস আন্দোলন হচ্ছে ফ্যাশন। সিমন অবশ্য একে প্রতিক্রিয়াশীল মনে করেন না যদিও সম্প্রতি পুনরুত্থান ঘটেছে বুর্জোয়াতন্ত্রের এক প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীরূপে। অথচ, আশ্চর্যের বিষয়, এর মধ্যে সার্ত্রের *লে মো* (*দা ওয়ার্ডস*/'শব্দ') বেরুলে তার সাফল্য হল অভূতপূর্ব। সিমনের

মতে, 'বইটি খুবই উল্লেখযোগ্য, তবে সার্ত্রের সেরা বই নয়, অন্যতম বটে। এই সাফল্যের কারণ বইটি 'কমিটেড' তথা দায়বদ্ধ নয়। সার্ত্রের 'বিবমিষা' যা তাঁর প্রথম রচনা তাও ডানবাম দু'পক্ষের কাছে ছিল সমান গ্রহণযোগ্য। অথচ নাটকের ক্ষেত্রে তা নয়। আমার ভাগ্যেও তাই ঘটেছে। বুর্জোয়া মহিলা সমাজ আমার 'কোনো এক লক্ষ্মী মেয়ের স্মৃতিকথা' পড়ে মুগ্ধ হয়েছিল কারণ ওতে তারা তাদের যৌবন খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী দু'টি খন্ড পড়ে তারা প্রতিবাদ করেছিল। ব্যাপারটা স্পষ্ট।

সিমনের 'পরিস্থিতির চাপ' গ্রন্থের শেষাংশ জুড়ে আলজেরিয়া যুদ্ধের ঘটনাবলী রয়েছে। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বিবৃত করেছেন বিষয়টি, যদিও সেকালে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে তিনি কখনো অংশ নিতেন না।

এই গ্রন্থের শেষের দিকে তাঁর একটি বাক্য নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। সিমন লিখেছিলেন; "সেই বিশ্বাসযোগ্য যৌবন সন্ধিক্ষণকে আমি যখন পেছন ফিরে অবিশ্বাসের সঙ্গে দেখি, তখন অবাক হয়ে যাই; কেননা আমি যেন কেমন করে প্রতারিত হয়ে গেছি"।

তাঁর শত্রুরা ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছে যে, তাঁর জীবন ব্যর্থ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁকে ভুলভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের ধারণা, মেয়েদের ছেলেপুলে নিয়ে ঘর-সংসার করা প্রয়োজন। আসল ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ তাঁর জীবন নিয়ে তিনি খুবই সন্তুষ্ট। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পেরেছেন। ফলত তাঁকে যদি আবার জীবন নতুন করে শুরু করতে হয় তাহলে তিনি ভিন্নভাবে জীবন যাপন করবেন না। সন্তানাদি না থাকার জন্যও তাঁর কোন দুঃখ নেই; যা তিনি করতে চেয়েছেন, সে শুধু লিখতে।

তাহলে 'প্রতারণা' কিসের?

'কেউ যখন অস্তিত্ববাদী বিশ্ববীক্ষা গ্রহণ করেন, যেমন আমি করেছি, তখন মানব জীবনের পর আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী অথচ বাস্তব সত্য হল :

একজন 'হতে' চেষ্টা করে, এবং শেষ পর্যন্ত অস্তিত্ববান থাকেন। এই বক্তব্যের অনৈক্যের কারণে যখন আপনি 'হওয়ার' ওপর গুরুত্ব আরোপ করলেন – যা একভাবে আপনি সবসময় করে থাকেন, যখন আপনি পরিকল্পনা করে থাকেন, যখন আপনি আসলে জানেন যে 'হওয়াতে' সফল হতে পারছেন না – তখন আপনি ঘুরে দাঁড়ান এবং পেছনের জীবনের দিকে তাকান, আপনি দেখেন যে আপনি শুধু অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছেন। অন্যভাবে বলতে গেলে জীবন আপনার পেছনে শক্ত বস্তুর মতো নেই, যেমন কোনো দেবতার জীবন (যেমন ধারণা করা হয় অর্থাৎ যা অসম্ভব কিছু)। আপনার জীবন শুধুমাত্র একটা মানব জীবন।

তখন কেউ বলতে পারেন, যেমন আল্যাঁ (ফরাশি দার্শনিক) বলেন, তাঁর এই উক্তি আমার খুব পছন্দ – 'আমাদের জন্য কিছুই প্রতিশ্রুত নয়" এক দিক থেকে এটা সত্য। অন্যদিক থেকে তা নয়। কেননা একজন বুর্জোয়া বালক বা বালিকা যে বিশেষ সংস্কৃতি পেয়েছে তা সম্ভবত তাদের কাছে প্রতিশ্রুত। আমি মনে করি যে, অল্পবয়সে যার জীবন কঠিন ছিল, পরবর্তীতে সে বলবেনা যে সে 'প্রতারিত' হয়েছিল। কিন্তু আমি যখন বলছি আমি 'প্রতারিত' তখন আমি চিহ্নিত করছি সেই সতের বছরের বালিকাকে যে ঝাড় গাছের বন্য এলাকায় যেয়ে দিবাস্বপ্ন দেখছিল যে সে পরে কী করতে পারে। আমার যা করার তা সবই করেছি, বই লিখেছি, বিবিধ বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেছি কিন্তু তবুও আমি 'প্রতারিত' হয়েছি, কেননা তার আর পর নেই। মালার্মের একটা পংক্তি রয়েছে – "বিষাদের সুগন্ধি রয়েছে অন্তরাত্মায়"। আমি যা চেয়েছি সব পেয়েছি এবং সব বলা ও করার পর দেখা গেল, যা চাওয়া হয়েছিল তা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ।

এক মহিলা মনস্তত্ত্ববিদ আমাকে খুব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে লিখেছেন যে, 'শেষ বিশ্লেষণে দেখা যাবে – অভিপ্রায় সব সময় অভিপ্রায়ের পাত্রকে পেরিয়ে যায়'। বাস্তবতা এই যে, আমি না – চেয়েই সবই পেয়েছি কিন্তু 'অনেক দূর পেরিয়ে যাই'। যা এই ইচ্ছায় ছিল তা পাওয়া গেল। এখন

ইচ্ছা পূর্ণতা লাভ করল। যখন আমার বয়স কম ছিল তখন আমার মনে অনেক আশা এবং এক জীবন দৃষ্টি সব সংস্কৃতিবান লোক এবং বুর্জোয়া আশাবাদীরা সবাইকে উৎসাহ দিয়ে থাকে। আমার পাঠকরা আমাকে দোষারোপ করে থাকে যে, আমি সেই উৎসাহ তাঁদের দিতে পারিনি। আমি শুধু এটাই বোঝাতে চেয়েছি এবং আমি যা করেছি বা ভেবেছি তার জন্য কোনো দুঃখবোধ নেই'।

তাঁর স্পষ্ট উচ্চারণ : ঈশ্বর ভাবনা তাঁর লেখায় নেই। 'সার্ত্র এবং আমি সব সময় বলেছি : এটা শুধু যে 'হওয়া'র একটা ইচ্ছা তা নয়, সে ইচ্ছা যে-কোনো বাস্তবতায় সমন্বিত হতে চায়। কার্ন্ট বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ে যা বলেছিলেন, এটা যথার্থভাবে তা-ই। ঘটনা হলো, যে কেউ পরিণতিতে বিশ্বাস করে : তবে তাকে বিশ্বাস করতে হবেনা যে কোথাও একটা উচ্চমার্গের কারণ রয়েছে। ঘটনা হলো এই যে, মানুষের ইচ্ছা আছে হওয়ার। তাতে এটা বোঝায় না যে সে 'হওয়া'কে পেতে পারে অথবা সেই 'হওয়া'টা একটা সম্ভাব্য ধারণা হবে। যে কোনোভাবে 'হওয়াটা' একটা চিন্তা এবং একইভাবে একটা অস্তিত্ব। অস্তিত্ব এবং 'হওয়ার' একটা সমন্বিত রূপ অসম্ভব। সার্ত্র এবং আমি সবসময় এটা প্রত্যাখ্যান করেছি এবং এই প্রত্যাখ্যান আমাদের চিন্তায় অবস্থান করে। মানুষের মধ্যে রয়েছে একটি শূন্যতা, এমনকি তার সাফল্যেও রয়েছে এই শূণ্যতা। আমি বোঝাতে চাচ্ছি না যে, আমি যা পেতে চেয়েছি তা পাইনি। বরং এটা যে, মানুষ যা ভাবে, প্রাপ্তি তা নয়। তাছাড়া এর একটা খুব হালকা বা ঔদ্ধত্যপূর্ণ দিক রয়েছে। কারণ মানুষ ভাবে যে, আপনি যদি একটি সামাজিক পর্যায়ে সাফল্য অর্জন করেন তাহলে আপনি অবশ্য সাধারণ মানব পরিস্থিতিতে পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট থাকবেন। কিন্তু আসলে তা নয়।

'আমি প্রতারিত' কথাটায় আরো কিছু বোঝায়। যেমন জীবন আমাকে এই বিশ্ব যেমন তাকে তেমনি আবিষ্কার করতে দিয়েছে এবং তা হলো, আমি প্রত্যক্ষ করছি – এমন এক বিশ্ব যা দুর্দশাগ্রস্ত ও অত্যাচারিত।

যেখানে অধিকাংশ মানুষ খাদ্যাভাবের শিকার। আমার বয়স যখন কম তখন এসব আমি জানতাম না। তখন আমার কল্পনায় ছিল, এমন এক বিশ্বকে আবিষ্কার করতে হবে যা শুধু সুন্দর। এইদিক থেকেও আমি বুর্জোয়া সংস্কৃতির দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলাম। আর তাই আমি অন্যদের প্রতারণাকে সাহায্য দিতে চাই না। অতএব, আমি কেন বলছি যে – 'আমি প্রতারিত' হয়েছিলাম। আমার ইচ্ছা, যাতে অন্যরা প্রতারিত না হতে পারেন। বাস্তবিকপক্ষে, এটাও একটা সামাজিক সমস্যা। সংক্ষেপে (বলি) আমি অল্প অল্প করে বিশ্বের অসুখী-ভাব আবিষ্কার করলাম। এবং অবশেষে সর্বতোভাবে আমি এটি অনুভব করলাম আলজেরিয়ার যুদ্ধের প্রসঙ্গে আর আমার ভ্রমণের সময়।

বার্ধক্য সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য অনেকের অপছন্দ । কারণ 'ওরা বিশ্বাস করতে চায় যে জীবনের সব পর্ব আনন্দঘন। শিশুরা নিরপরাধ ও সব বিবাহিত দম্পতি সুখী। সব পূত-পবিত্র। আমি এসব ধারণার বিরুদ্ধে সারা জীবন বিদ্রোহ করে আসছি। এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই সময় যা আমার জন্য বৃদ্ধ বয়স নয় বরং বৃদ্ধ বয়সের শুরুটাই প্রতিনিধিত্ব করে, এমনকি কেউ যদি যা চায় তার সবই পেয়ে থাকে, তখনও। স্নেহ-মমতা প্রদর্শনের মতো কাজ – যে কারো অস্তিত্বে পরিবর্তন ঘটায়। এই পরিবর্তন বহু কিছু হারানোর দ্বারা চিহ্নিত'। কেউ যদি এগুলো হারানোতে দুঃখিত না হন তার মানে এসব তাদের পছন্দের ছিল না। খুব দ্রুত কেউ বার্ধক্য বা মৃত্যুকে মাহাত্ম্যমন্ডিত করেন। তাঁরা আসলে জীবন ভালোবাসেন না। অবশ্যই আপনাকে বলতে হবে : আজকের ফ্রান্সে সব কিছু চমৎকার, এমনকি মৃত্যুও'।

স্যামুয়েল বেকেট এবং 'নব্য ঔপন্যাসিকদের' মধ্যে তুলনাত্মক এক প্রশ্নের জবাবে সিমন মানব পরিস্থিতিতে প্রতারিত হবার ব্যাপারটা বেকেট যে তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করেছেন তা স্বীকার করেন। তাই তাঁর লেখার প্রতি সিমনের আকর্ষণ রয়েছে। অন্যদিকে, তাঁর মতে, নব্য উপন্যাসের প্রবক্তারা

যা বলতে চাইছেন, তা ফকনারে পাওয়া যাবে। তিনিই তাঁদের শিখিয়েছেন তা কেমন করে করতে হয় এবং এ ব্যাপারে তিনিই শ্রেষ্ঠ। বেকেটের ব্যাপারে বলতে গেলে তিনি যে জীবনের অন্ধকার দিককে উদ্ভাসিত করতে চেয়েছেন, তা সিমনের কাছে খুবই সুন্দর প্রতীয়মান হয় । বেকেট নিশ্চিত যে , জীবন অন্ধকার এবং শুধু তাই । 'আমিও নিশ্চিত যে, জীবন অন্ধকার এবং একই সময় আমি জীবন ভালোবাসি । ...'

নিজের মূল্যায়ন সম্পর্কে সিমন নিস্পৃহ। তাঁর মতে, 'কিসের এই মূল্যায়ন? শোরগোল, নিস্তব্ধতা, উত্তরসুরি, পাঠকসংখ্যা, পাঠকের অভাব, বিশেষ সময়ে গুরুত্ব? আমার মনে হয়, মানুষ আমাকে কিছুকাল পড়বে। অন্তত তাই আমাকে আমার পাঠকরা বলেন। আমি কিছু অবদান রেখেছি – নারীদের সমস্যাসমূহের আলোচনায়। যেসব চিঠিপত্র আমি পাই তাতে আমি জানি – আমার কাজের সাহিত্যিক 'গুণ' সম্পর্কে। শব্দটির যথার্থ অর্থ সম্পর্কে বলতে গেলে, আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই'।

অস্তিত্ববাদের প্রবক্তা : অরুণ মিত্রের বক্তব্য

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু থেকে প্রথম দশ বছরের সবচেয়ে বড় সাহিত্যিক আন্দোলনের ভিত্তি নিরীশ্বর অস্তিত্ববাদ। যদিও এ এক দর্শনতত্ত্ব তবু তাকে অবলম্বন ক'রে সাহিত্যে যে – ফসল ফলেছে তা বিস্ময়কর। ঝাঁ-পল সার্ত্র-এর প্রবল ব্যক্তিত্ব এই চিন্তা ও সৃষ্টির কেন্দ্রে। আপাতদৃষ্টিতে এই মতবাদ মনে হয় যেন নৈরাশ্যের। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। অস্তিত্ববাদী রচনার তাৎপর্যে এবং সার্ত্র্-এর ব্যক্তিগত সংগ্রামী আচরণে তা প্রতীয়মান। সার্ত্র্-এর একদা ঘনিষ্ঠ সহযোগী কাম্যুর কণ্ঠেও তা প্রকাশিত। মানুষের অস্তিত্বই একমাত্র গ্রাহ্য বস্তু এবং এ অস্তিত্বের ভিতরে ও চারিদিকে কোনো যৌক্তিকতা নেই, মানবিক প্রকৃতি বলে সাধারণ সারসত্তা কিছু নেই, এবং ঈশ্বর আছেন এমন কোনো সত্যের প্রতিফলন মনুষ্য-জগতের ঘটনাবলীতে নেই – শুধু এই সিদ্ধান্তেই সার্ত্রীয় মতবাদ আবদ্ধ নয়। তার এক মূল কথা হল এই যে, মানব-প্রকৃতির কোনো নির্দিষ্ট বা পূর্ব-নির্ধারিত সংজ্ঞা নেই বলেই প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনতা সীমাহীন, প্রত্যেক মানুষ বাঁচার মধ্যে দিয়েই তার সারসত্তা সৃষ্টি করে, প্রত্যেক মানুষ নিজেকে যা করে তা-ই হতে পারে। নিজের প্রতি তার দায়িত্ব হল এই স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করা এবং অন্যদের উপলব্ধি করানো। অতএব অস্তিত্ববাদী মতে সাহিত্যসৃষ্টিও হবে দায়িত্বশীল, 'শিল্পের জন্যে শিল্প নয়', সাহিত্যকে হতে হবে engagée, মনুষ্য ব্যাপারে সচেতনভাবে লিপ্ত।

এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান চিন্তাবিদ ও শিল্পী সিমন দ্য বোভোয়ার-এর উক্তি এ সম্পর্কে স্পষ্ট। তিনি এক বিবৃতিতে বলেন; "নিষ্ক্রিয় হতে অস্বীকার ক'রেই মানুষ মানুষ, যে – আকুতি তাকে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে নিক্ষিপ্ত করে এবং সব জিনিষকে আয়ত্ত করার ও নিজের

অভিপ্রায় অনুযায়ী রূপায়িত করার লক্ষ্যে তাকে ঠেলে দেয় সেই আকুতির দ্বারাই মানুষ মানুষ। তার কাছে, থাকা মানেই হল অস্তিত্বকে পুনর্গঠন করা, বাঁচা মানেই হল বাঁচার ইচ্ছা করা"। তাঁর উপন্যাসের এক নায়কের মুখেও শোনা যায় : "আমি পৃথিবীকে সৃষ্টি করিনি; কিন্তু তাকে আমি আমার উপস্থিতি দ্বারা প্রতি মুহূর্তে পুনঃসৃষ্টি করি"।

কাম্যু যদিও নিজেকে অস্তিত্ববাদী বলে অভিহিত করতে অস্বীকার করেন, তবু তাঁর বক্তব্য কার্যত এর কাছাকাছি। মানুষের অস্তিত্ব অর্থহীন, ঈশ্বর নেই, যৌক্তিকতা নেই, ন্যায় নেই; এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় আত্মহত্যা, কিন্তু আত্মহত্যার মানে অর্থহীনতাকে প্রশ্রয় দেওয়া, তার কাছে আত্মসমর্পণ করা, সুতরাং একমাত্র পথ হল বিদ্রোহ; হত্যায় আকীর্ণ জগতে ঈশ্বরবিশ্বাস – মুক্ত মানুষ যদি অন্য মানুষের সম্বন্ধে সচেতন হয় তাহলেই সে তার অস্তিত্বের অর্থহীনতাকে অতিক্রম করতে পারে।

এ দর্শনতত্ত্বের বিশদ উপলব্ধি যতই কঠিন হোক, সাহিত্যকে তা গভীরভাবে উজ্জীবিত করেছে। মানুষ যে ধরাবাঁধা ছকের জিনিষ নয়, তার সত্তার সার নিরন্তর সৃষ্টি ও আবিষ্কারের বিষয়, এই বোধ এবং অন্যের সম্বন্ধে চেতনা-এ দু'য়ের শিল্প-সম্ভাবনা স্পষ্টতই অন্তহীন। সুতরাং সার্থক শিল্পকর্ম এই মহলের প্রতিভাবান লেখকরা আমাদের উপহার দিয়েছেন। সবচেয়ে যা উল্লেখযোগ্য তা এই যে, এদের রচিত সাহিত্য দর্শনতত্ত্বের প্রমাণপঞ্জী নয়, নিছক সাহিত্য হিসেবেই তার যোগ্যতা অবিসংবাদী।

এই আন্দোলনের শীর্ষে ঝাঁ-পল সার্ত্র্। সব বিষয়েই তিনি অসাধারণ-মনীষায়, শিল্প- ক্ষমতায় এবং সততায়, সাহস যার এক অন্তর্নিহিত উপাদান। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিল্পীর সাহস যে কী প্রচন্ড হতে পারে, তার অন্যতম দৃষ্টান্ত তিনি। লেখকদের চাটুকারিতা এবং আত্মসমর্পণের যুগে এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা উচিত। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। বছর চারেক আগে ফ্রান্সে একটি দল ধরা পড়ে, তাঁরা ফরাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামরত স্বাধীনতাকামী আলজিরিয়ানদের গোপনে সাহায্য দিচ্ছিলেন; এই গুপ্ত দলের সঙ্গে সার্ত্র-এর সংযোগ ছিল। ফ্রান্সের সামরিক আদালতে

ধৃতদের বিচার আরম্ভ এবং প্রসঙ্গক্রমে সার্ত্র-এর নামও ওঠে। তিনি সে সময় দক্ষিণ আমেরিকায় ভ্রমণরত ছিলেন। তাঁর কথা উঠেছে জেনে তিনি সেখান থেকে সামরিক ট্রাইবিউনালের সভাপতির কাছে এক পত্র লেখেন। পত্রটি পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়। যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন কী দারুণ সেই পত্র। ভাষায় ও ভাবে শাণিত তলোয়ারের মতো। ফরাসী সরকারের গর্হিত সাম্রাজ্যবাদী আচরণ এবং যে সব তথাকথিত বিপ্লবী কার্যকালে আলজিরিয়ানদের সাহায্য দিতে পরাঙ্মুখ তাদের আচরণ তিনি কঠিন আঘাতে জর্জরিত করেন এবং নিজের অটুট সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন; পরিশেষে সামরিক বিচারকর্তাকে এ কথা মনে রাখতে বলেন যে বিচারকর্তার ভূমিকায় তিনি এক প্রহসনের অভিনয় করছেন, যেরকম প্রহসন ইতিআসে অনেকবার অভিনীত হয়েছে। এর পর সার্ত্র কে রাষ্ট্রদ্রোহে অভিযুক্ত করার দাবীতে কাগজপত্রে খুব সোরগোল ওঠে। কিছুদিন বাদে উগ্র উপনিদেশবাদী ফরাসীরা যখন ফ্রান্সের মধ্যে সন্ত্রাসমূলক আক্রমণ আরম্ভ করে, তখন একাধিকবার বোমার দ্বারা সার্ত্র-এর প্রাণনাশের চেষ্টা হয়।

সার্ত্র-এর উপন্যাস, গল্প ও নাটক পড়ার সময় তাঁর দার্শনিক মনীষার কথা আমাদের মনে আসে না। এইখানেই শিল্পীরূপে তাঁর কৃতিত্ব। La Nausée তাঁর প্রথম উপন্যাস। ১৯৩৮ সালে এটি প্রকাশিত হওয়ার অল্প-দিনের মধ্যেই তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করেন। এর নায়ক রকাঁত্যাঁ-র বিবর্ণ জীবন, তার চারপাশের সব কিছুর অনুজ্জ্বলতা, নিজের কাছে নিজের বাহুল্যবোধ, তার বিবমিষা, অবশেষে নিজের সত্তার স্বাধীনতাবোধে বাঁচার যুক্তি অনুভব-এর বিবরণে অসামান্য শিল্পীর স্বাক্ষর স্পষ্ট। তাঁর ছোট গল্পগুলিতেও সেই দক্ষতা। Les Chemins de la Liberté স্পেন-যুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত বৃহৎ পটভূমিতে বিভিন্ন ব্যবহারের অনেকগুলি একত্রিত মানুষের কাহিনী, যাদের ব্যক্তিগত ঘটনা ইতিহাসের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, আপাতনির্দিষ্টতা সত্ত্বেও যারা নতুন নতুন ভাবে উদ্ভাসিত, যাদের চরিত্র প্রতি মুহূর্তে অন্য সম্ভাবনার সম্মুখে।

সার্ত্র-এর রচনার আঙ্গিক বিস্তারিত আলোচনার বিষয়। এখানে শুধু তাঁর ভাষার উল্লেখ করি। ফরাসী গদ্যের একটা মোড় সার্ত্র। ভাষার উপর তাঁর আধিপত্য বিস্ময়কর। স্থূল সূক্ষ্ম যে -কোনো শ্রেণীর শব্দকে তিনি অতি স্বাভাবিকভাবে এক প্রবহমান গদ্যে গ্রথিত করেন। একসঙ্গে বহতা ও কঠিনতার এমন সমন্বয় আর কারো গদ্যে দেখা যায় না। অলঙ্কার তিনি বর্জন করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর রচনার স্থানে স্থানে কাব্য বিচ্ছুরিত হয়।

সিমন দ্য বোভোয়ার সার্ত্র -এর কর্মসঙ্গিনী এবং জীবনসঙ্গিনী। সম্প্রতি তাঁর আত্মজীবনীর যে তৃতীয় খন্ড (La Force des choses) প্রকাশিত হয়েছে তাতে সার্ত্র-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তিনি বিশদভাবে অকপটে বিবৃত করেছেন । লেখক হিসেবে বোভোয়ার -এর অসাধারণত্বও স্পষ্ট । মেয়েদের মধ্যে তাঁর মতো মনীষা বিরল। তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ-গ্রন্থ তার স্বাক্ষ্য। মেয়ে হিসেবে সকরুণ সুবিবেচনা তাঁর প্রাপ্য নয়, নিজের ক্ষমতায় পুরুষের পাশে তাঁর আসন। তাঁর উপন্যাসও 'মেয়েলী' উপন্যাস নয়। উৎকর্ষের সে জাতিবিচার তাঁর সম্বন্ধে প্রয়োগ করা চলে না। তাঁর প্রথম উপন্যাস L' Invitée (১৯৪৩) প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খ্যাতি অর্জন করে। মূলত এ সেই ত্রয়ীর কাহিনী : এখানে দুই নারী, এক পুরুষ। কিন্তু এ কাহিনীকে বোভোয়ার মানব-অস্তিত্বের গভীরতর তাৎপর্যে মন্ডিত করেছেন। অন্যের জন্যে দায়িত্ব নিতে যতই অগ্রসর হইনা কেন, অন্যতার বাধা পাঁচিল হয়ে দাঁড়ায় : অবশেষে মানুষ ধ্বংসের দ্বারা অন্যতাকে ধ্বংস করতে চায় এই ধরণের এক ট্র্যাজিক আবহাওয়ার গ্রন্থের পরিণতি। Le Sang des autres-এর নায়ক এক শিল্পপতির সন্তান যে তার শ্রেণীকে বর্জন করেছে, সে জার্মানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের যোদ্ধা। লক্ষ্য ও পদ্ধতির উভসংকটের মধ্যে তার কাহিনীর বিবর্তন। তাঁর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য উপন্যাস Les Mandarins-তে তিনি যুদ্ধ-পরবর্তী বছরগুলিতে বামপন্থী মহলের এক ধরণের বিবরণী দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, লেখিকার প্রচ্ছন্ন বেদনাময় আত্মস্বীকৃতি যার সঙ্গে জড়িত।

কাম্যুর সাহিত্য-প্রতিভা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়েছিল নোবেল প্রাইজের দ্বারা। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়, অনেক অযোগ্য লেখকও নোবেল প্রাইজ পেয়ে থাকেন। ১৯৪২ সালে L'Etranger উপন্যাস তাঁর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক বৈর পৃথিবীতে মানুষ যেন ভিন্‌দেশী, নিজের কাছেও সে ভিন্‌দেশী, মানুষের পরিপার্শ্ব অর্থহীন-নায়ক ম্যোরসো-র জীবন ও আচরণের বিবরণ এই বক্তব্যকে আশ্চর্যভাবে প্রতিফলিত করেছে। এর পর La Peste কাম্যুকে আরও খ্যাতিমান করে। আলজিরিয়ার ওরান শহরে প্লেগ মহামারীর প্রাদুর্ভাব, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সেই অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণ এ উপন্যাসের বিষয়। নাৎসী দখল ও তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের এ এক রূপক কাহিনী, সাধারণভাবে এই ব্যাখ্যাই স্বীকৃত। তবে মানুষের উপর চাপানো যে কোনো ব্যাপক অন্যায়কে প্লেগ বলে ধরে নেওয়া যায়। নিঃসন্দেহে এর বক্তব্যের ব্যাপ্তি সাধারণ মানবিক অবস্থার প্রশ্নে। ধর্ম ও নীতির প্রসঙ্গও লেখক এতে উত্থাপন করেছেন। পরিশেষে ডাঃ রিয়্যোর জবানীতে মানুষের প্রতি ভালোবাসার সুরটাই সবচেয়ে বেশি ধ্বনিত। পরবর্ত্তী উপন্যাস La Chute-এ কাম্যু মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্বের প্রশ্নই উত্থাপন করেছেন। অন্যের অপরাধ শুধু অন্যের নয়, তার জন্যে প্রত্যেক মানুষই নিজের কাছে দায়ী, এই রকম উপলব্ধি এর বিষয়।

আমাদের দুর্ভাগ্য, মোটর দুর্ঘটনায় কাম্যুর জীবন অকালে শেষ হয়। তাঁর কাছ থেকে মহৎ সৃষ্টির আরও প্রত্যাশা ছিল সকলের। কাম্যুর রচনা-শৈলী সার্ত্র থেকে খুবই পৃথক। তাঁর ভাষার বৈশিষ্ট্য তার দৃঢ়নিবদ্ধতায়, তার সারল্যে। একটুও উচ্চকণ্ঠ না হয়ে কাম্যু তাঁর রচনায় প্রবল আবেগ সঞ্চার করতে পারতেন"।

(কবি ও ফরাশি সাহিত্য বিশেষজ্ঞ ডঃ অরুণ মিত্রের এই অসাধারণ রচনাংশ সংকলিত হয়েছে *ফরাসী সাহিত্য প্রসঙ্গে* (কলকাতা : প্রমা প্রকাশনী ১৯৮৫; পৃষ্ঠা ৮০-৮৪। বানান লেখকের, শিরনাম আমাদের)।

দ্বিতীয় লিঙ্গ প্রসঙ্গ

সিমন দ্য বোভোয়ার-এর *ল্য দ্যোজিয়েম সেক্স* (দ্বিতীয় লিঙ্গ) বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে, প্রখ্যাত প্রকাশক গালিমার কর্তৃক। এর আগে-পরে তাঁর উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, দর্শন, আত্মকথা ও নাটক বেরিয়েছে। আবাল্য লেখালেখির জগতে প্রবেশের অভিপ্রায় থাকলেও তিনি প্রকাশনার ক্ষেত্রে এসেছেন বেশ পরে। বয়স চলিশ পার হলে সিমন তখন একজন পাকা লেখক। *ল্য দ্যোজিয়ম সেক্স* এর ইংরেজি অনুবাদ প্রথম ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত হল ১৯৫৩ সালে জোনাথান ক্যাপ লিমিটেড-এর দ্বারা। এইচ. এম.পার্শলে কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত। মার্কিন প্রতিষ্ঠান ভিন্টেজ পেপারব্যাকে বইটা বের করেছে ১৯৯৭ সালে। খুবই ঘন ছেদহীন টাইপে ছাপা নির্ঘন্টসহ পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭৬২।

সূচি

অনুবাদকের ভূমিকা ৭
অবতরণিকা ১৩

প্রথম খন্ড
বাস্তবকাহিনী ও মিথ

প্রথমভাগ
নিয়তি
১. জীববিদ্যার তথ্য ৩৫
২. মনোবিশেষণভিত্তিক দৃষ্টিকোণ ৬৯
৩. ঐতিহাসিক বস্তুবাদভিত্তিক দৃষ্টিকোণ ৮৪

দ্বিতীয় ভাগ
ইতিহাস
১. যাযাবর ৯৩
২. জমির আদি চাষী ৯৭
৩. পিতৃতান্ত্রিক যুগ ও চিরায়ত প্রাচীন কাল ১১৩
৪. মধ্যযুগসহ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্স ১২৮
৫. ফরাশি বিপ্লব থেকে : কাজ ও ভোটের অধিকার ১৩৯

তৃতীয় ভাগ
মিথসমূহ
১. স্বপ্ন, ভয় ও আরাধ্য ১৭১
২. নারী মিথ সৃষ্টিতে পাঁচজন লেখক ২২৯
(ক) মোঁতেরলঁ বা বিরক্তির খাদ্য ২৩০
(খ) ডি এইচ লরেন্স অথবা পৌরুষ-পর্ব ২৪৫
(গ) ক্লোদেল এবং প্রভুর কাজের মেয়ে ২৫৪
(ঘ) ব্রতোঁ অথবা কবিতা ২৬১
(ঙ) স্তঁধাল অথবা বাস্তবতার রোঁমতিকতা ২৬৮
(চ) সংক্ষিপ্তসার ২৭৮
৩. মিথ এবং বাস্তবতা ২৮২

দ্বিতীয় খন্ড
আজকের নারী জীবন

চতুর্থ ভাগ
প্রস্তুতির বছরগুলো
১. বাল্যকাল ২০৫
২. যুবতী ২৫১
৩. রতিক্রিয়ার সূত্রপাত ৩৯২
৪. লেসবিয়ান ৪২৪

পঞ্চম ভাগ
অবস্থান
১. বিবাহিতা মহিলা ৪৪৫
২. মা ৫০১
৩. সামাজিক জীবন ৫৪২
৪. গণিকা ও রক্ষিতা ৫৬৮
৫. পূর্ণকাল প্রাপ্তি থেকে বার্ধক্য ৫৮৭
৬. নারীর অবস্থান এবং চরিত্র ৬০৮

ষষ্ঠ ভাগ
১. নার্সিসিস্ট নারী ৬৪১
২. প্রেমে নারী ৬৫২
৩. মরমী নারী ৬৭৯

তৃতীয় খন্ড
মুক্তির পথে
১. মুক্ত নারী ৬৮৯
উপসংহার ৭২৪
নির্ঘন্ট ৭৪৩

ঢাউস বই লেখা সিমনের পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ। তবে সবই পাঠযোগ্য এবং প্রয়োজনীয়। তাই বইটির অনুবাদ হয়েছে বহু ভাষায়। বাংলায়ও আমরা পাচ্ছি দুটি অনুবাদ। খুবই কাছাকাছি সময়ে ঢাকা এবং কলকাতা থেকে অনুবাদ গ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম অনুবাদ প্রস্তুত হয়েছে ড. হুমায়ুন আজাদ কর্তৃক।

প্রকাশকের বক্তব্যে গ্রন্থটির দ্বিতীয় কভারে উলেখিত হয়েছে যে, '... হুমায়ুন আজাদ, যিনি তাঁর *নারী* নামক একদা নিষিদ্ধ বইটির জন্য হয়ে উঠেছেন বাঙলায় নারীবাদের প্রধান প্রবক্তা। ... অসাধারণ গদ্যে প্রকাশ

করেছেন মূলগ্রন্থের জ্ঞান ও সৌন্দর্য, যা বাঙলার পাঠকদের কাছে এক অলৌকিক বিস্ময় বলে মনে হবে।' বটে! তবে বইটি মূল থেকে অনূদিত নয়। ইংরেজি থেকে ভাষান্তরিত। তাও পুরোপুরি নয় বহু বাদসাদ দিয়ে। অবশ্য অনুবাদক ও প্রকাশকের প্রয়াস সাফল্যমন্ডিত হয়েছে। অল্প সময়ে (ফাল্গুন ১৪০৭ থেকে বৈশাখ ১৪১৪-র মধ্যে বইটি লাভ করেছে চতুর্থ মুদ্রণ (পৃঃ সংখ্যা ৪০০)।

ড. আজাদ লিখেছেন, 'তত্ত্ব, দর্শন, ব্যাখ্যা প্রভৃতির কথা ছেড়ে দিলেও থাকে এর অনন্য শিল্পিতা, সৌন্দর্য, অজস্র উৎকৃষ্ট কবিতার রূপক, উপমা, চিত্রকল্প জড়ো হয়ে আছে এই বইয়ে, এর বর্ণনাগুলোতে আছে এমন নিবিড়তা, যা ক্ষণে ক্ষণে মন ও ইন্দ্রিয়গুলোকে দেয় পরম শিহরণ, যদিও মূল বই আমি পড়িনি'। (পৃঃ১৬)।

অন্যদিকে প্রকাশক সিমন দ্য বোভোয়ারকে 'নারীবাদের আইনস্টাইন' ঘোষণা করে লিখেছেন, 'সভ্যতাব্যাপী নারীর পরিস্থিতি সম্পর্কে এমন অসাধারণ গ্রন্থ আর লেখা হয়নি, সম্ভাবনাও নেই, অদ্বিতীয় এ গ্রন্থ ... যার পাতা থেকে বেরিয়ে এসেছে বিশ শতকের দ্বিতীয়াংশের নারীবাদ এবং পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতাকে বদলে দিয়েছে নানাভাবে'।

অতিশয়োক্তি ছাড়াও সিমন সম্পর্কে কিছু তথ্যগত ভুলভ্রান্তি রয়েছে ভূমিকাংশে। কিন্তু গ্রন্থটি সুখপাঠ্য বললে কম বলা হবে, বাংলা ভাষায় এটি এক উলেখযোগ্য সংযোজন।

কলকাতা থেকে একই সালে অর্থাৎ ২০০১ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমতী লতিকা গুহ ভাষান্তরিত *স্ত্রীলিঙ্গ* গ্রন্থটির প্রথমখন্ড প্রকাশিত হয় (২৪৭ পৃঃ)। দ্বিতীয় খন্ড বেরোয় নভেম্বর ২০০৩ সালে (৪৫৫ পৃঃ)। এটিও ইংরেজি থেকে অনূদিত।

মূল ফরাশি বইটি হাতের কাছে না থাকাতে তিনটি অনুবাদ সম্পর্কে এখানে আমরা কোন মন্তব্য প্রকাশে বিরত থাকছি। তবে বাংলা ভাষায় এই দুরূহ কাজ সম্পাদন করে অনুবাদকদ্বয় দুই বাংলার বহু ব্যক্তিকে সিমন দ্য

বোভোয়ারের অসামান্য চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত করবার যে প্রয়াস নিয়েছেন – তা অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য।

১৯৪৯ সালে, সদ্য চল্লিশ-উত্তীর্ণ একজন ফরাশি মহিলার পক্ষে এ ধরনের এবং এই মাত্রার গ্রন্থ রচনা একটা ভয়ানক বিস্ময়কর ব্যাপার। বলা চলে, এটা একটা বম্বশেল! এ্যাংলো-স্যাকসন, স্কেনডিনেভিয়ান মহিলা বুদ্ধিজীবী হলেও একটা কথা – কিন্তু সিমন যেমন অতি-সূক্ষ্ম বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন সমাজসচেতন ও বিজ্ঞদৃষ্টিসম্পন্ন মহিলা, তেমনি অসম সাহসী এবং অনুপম ব্যক্তিত্বের অধিকারিণীও বটে। ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান এবং সাহিত্যের অধিকারলব্ধ জ্ঞান যেমন তাঁকে বিশ্বে নারীর অবস্থান নির্ণয়ে সহায়তা দেয়, তেমনি অস্তিত্ববাদী দর্শন ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁর জন্য নারীর ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট পথনির্দেশের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনের সুযোগ সৃষ্টি করে। এবং তা শুধু নারীর ক্ষেত্রে নয়,পুরুষের পক্ষেও বটে।

তাঁর মতে, 'প্রদত্ত পৃথিবীর মধ্যে পুরুষকেই প্রতিষ্ঠা করতে হবে স্বাধীনতার রাজত্ব। চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য একইভাবে প্রয়োজন নারী ও নর যেন তাদের প্রাকৃতিক পৃথকতার দ্বারা এবং তার ভেতর দিয়েই দ্ব্যর্থহীনভাবে আবদ্ধ হয় মৈত্রীর বন্ধনে'।

দ্বিতীয় লিঙ্গের পরে

আমাদের সৌভাগ্য, *দ্বিতীয় লিঙ্গ* বাংলায় প্রকাশের আগে প্রকাশিত হয়েছে *দ্বিতীয় লিঙ্গের* পরে – সীমন দ্য ব্যোভোওয়া-এর সঙ্গে কথোপকথন। চট্টগ্রাম থেকে নারীকেন্দ্রিক প্রকাশনী 'খনা' বইটি প্রকাশ করেছে ফেব্রুয়ারি ২০০০ সনে। বইটির গ্রন্থকার অ্যালিস শোয়ার্জার, সম্পাদনা আলম খোরশেদের। দ্বিতীয় লিঙ্গ গ্রন্থের পঞ্চাশ বছর পূর্তির সঙ্গে একটা সম্পর্কও রয়েছে এই ছোট্ট বইয়ের (৮৮ পৃঃ)। জর্মন সাংবাদিক শোয়ার্জার ১৯৭২ থেকে ১৯৮২ সাল ইস্তক দশবছরে সিমনের ছয়টি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন। "বিদায় সার্ত্র" অংশে আমরা তাঁর প্রসঙ্গ উল্লেখিত দেখতে পাই।

সম্পাদক আলম খোরশেদ দুটি ভূমিকা লিখেছেন, একটি নিজের, অন্যটি শোয়ার্জার-এর অনুবাদ। গ্রন্থটিতে সিমনের একটি 'প্রাককথন' রয়েছে যা ছোট্ট কিন্তু খুবই যুক্তিপূর্ণ। এতে আমরা জানতে পারছি যে, ১৯৭০-এর পর থেকে 'নব্য নারীবাদ' আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে এবং তাতে তিনি সক্রিয় থাকেন। 'অভিজ্ঞতার আলোকে চিন্তাগুলোকে সংগঠিত' ও বিবর্তিত হতে দেয়া সিমনের জীবন সাধনার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

শোয়ার্জার তাঁর ভূমিকায় সার্ত্রের ঘরে সিমনের সঙ্গে পরিচয় এবং সিমন চরিত্রের দার্ঢ্য ও কোমলতা সম্পর্কে মন্তব্য করেন। তিনি তাঁকে স্মরণ করেন নারীরূপে সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও 'নিজের ইচ্ছেমতো প্রথা ও সংস্কারমুক্ত জীবনযাপন করতে পারার সম্ভাবনার প্রতীক-রূপে'।

এর আগে তিনি নারীবাদী আন্দোলন থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন কেননা তাঁর বিশ্বাস ছিল 'সমাজতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নারী প্রশ্নটির সমাধানও হয়ে যাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই'। ১৯৭২-এর বিখ্যাত সাক্ষাৎকার

প্রকাশের পরের বছর একটি প্রামান্যচিত্রও তৈরি করেন রোমে যাতে সার্ত্রও ছিলেন।

শোয়ার্জার সিমনকে 'আমাদের সময়ের সবচেয়ে সৎ ও বিপ্লবী নারীবাদী চিন্তাবিদ' রূপে আখ্যায়িত করেছেন। সিমনের একটি উদ্ধৃতি এখানে স্মরণযোগ্য : "আমি সারা জীবনে এমন কারো দেখা পাইনি যে আমার মতো পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিল সুখী হবার জন্য কিংবা তাকে অর্জন করার জন্য এমন গোঁয়ারের মতো লড়াই করেছে"। তাছাড়া 'তাঁর কাছে, কাজই তাঁর জীবন'।

প্রথম সাক্ষাৎকারটি 'আমি নারীবাদী' ১৯৭২ সালে প্যারিসে গৃহীত। অনুবাদ করেছেন অদিতি ফাল্গুনী ও সায়েমা খাতুন (ঢাকা)। নিঃসন্দেহে নারী আজ সম্পূর্ণ স্বাধীন – এই মনোভাবের পরিচয় সিমন তুলে ধরেন তাঁর কথোপকথনে।

"আমরা সমালোচনার উর্ধে নই" শীর্ষক দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারটি (১৯৭৩) অনুবাদ করেছেন মীনাক্ষী দত্ত। এটি রোমে গৃহীত ডকুমেন্টারি ফিল্মরূপে এবং আগেই উলেখিত হয়েছে যে এতে সার্ত্রও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

উলেখযোগ্য সার্ত্রের একটি উক্তি "... আমরা পরস্পরকে সর্বতোভাবে প্রভাবিত করেছি"। সিমনের মতে, এটা একজীবনের *অজমোসিস* (যুক্তিতর্কের সাহায্যে নয়, আপন গতিতে ধীরে ধীরে গ্রহণযোগ্য হবার প্রক্রিয়া)।

তৃতীয় সাক্ষাৎকার "দ্বিতীয় লিঙ্গ : তিরিশ বছর ধরে" (১৯৭৬) অনুবাদ জেরীন চৌধুরীর। শোয়ার্জার-এর মতে, "*দ্বিতীয় লিঙ্গ* বলতে গেলে এখনও নারীবাদের বাইবেল যার বিক্রি শুধু আমেরিকাতেই দশ লক্ষ কপির বেশি, আদতে একটি দার্শনিক ও তাত্ত্বিক পুস্তকই ছিল ১৯৪৯ সালে ..."।

সিমন জানিয়েছেন যে, এটি প্রকাশের পর প্রতিক্রিয়া ছিল 'অত্যন্ত তীব্র, খুবই হিংস্র। বই ও আমার উভয়ের প্রতিই'।

উপসংহারের কথাগুলো মূল্যবান : "শাশ্বত নারীত্ব একটি অসত্য। কেননা মানুষের বিকাশে প্রকৃতির ভূমিকা খুবই ক্ষুদ্র। আমরা সামাজিক

মানুষ। আমি যেমন বিশ্বাস করি না প্রকৃতিগতভাবে নারী পুরুষের চেয়ে অপকৃষ্ট, তেমনি এও বিশ্বাস করি না যে তারা সহজাতভাবেই উৎকৃষ্ট"।

চতুর্থ সাক্ষাৎকারের শিরোনাম "মেয়েরা আর কতই বা নিচে পড়তে পারে" (১৯৭৮)। এটি অনুবাদ করেছেন সাকী সেলিমা।

প্রসঙ্গত সিমন বলেন, "... সবসময় যতটা সম্ভব আমার মনের কথা খুলে বলেছি"।

পঞ্চম আলাপচারিতাটি ছিল "পৃথিবীর বিরুদ্ধে একটি ভোট" বিষয়ক (১৯৮০)। অনুবাদ হোমায়রা আহমদের। একটা উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য : "... আমি শুধু ভাবি, যে সরকারের আমলে নিম্নতম – মজুরি অথবা অবসর ভাতা সামান্য হলেও বাড়বে কিংবা শ্রমিক শ্রেণী ও তাদের ইউনিয়ন সমূহের দাবি-দাওয়া মেনে নেয়া হবে, তাহলে আমি সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি আমরা গভীর বিরাগ ও আপত্তি সত্ত্বেও সেই সরকারকে অন্য কারো চাইতে শ্রেয় মনে করব"। (পৃঃ ৭৪)

সর্বশেষ সাক্ষাৎকারটি "নারী হওয়াটাই যথেষ্ট নয়"। অনুবাদ করেছেন তাসনিম সালেহ। এতে সার্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ে অনেক খোলামেলা আলোচনা সিমনের : "... খুব কোমল এবং একই সঙ্গে খুব সুখী একটি সম্পর্ক ছিল তা। খুব বিশ্বস্ত একটি সম্পর্ক, বুদ্ধিগত এবং আবেগগতভাবে। ... যেখানে সার্ত্রের দর্শন জড়িত সেখানে একথা বলা ন্যায্য হবে যে আমি তাঁর কাছ থেকেই পথনির্দেশ পেয়েছি। কেননা আমার জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলার দায় ছিল আমারই আর আমার কাছে পরিপূর্ণতা মানে কাজ, প্রথমত এবং প্রধানত। ... কিন্তু মোটের ওপর সবসময়ই আমার বিবেক পরিষ্কার ছিল"।

সাহিত্যকর্মে সিমন প্রধানত নিজের পথেই চলেছেন। তবে সার্ত্রের পরামর্শও গ্রহণ করেছেন, যেমন সার্ত্রও রচনা সংশোধন করেছেন সিমনের বিরুদ্ধ অভিমতের কারণে।

নারীর প্রতি সিমন দ্য বোভোয়ার-এর প্রায় শেষ বক্তব্য : "আমার মতে, নারীবাদের আসল কাজ হল সমাজের পরিবর্তন সাধনের ভেতর দিয়ে নারীর অবস্থান বদলানো"।

সাহিত্য কী করতে পারে?

সাহিত্যের ক্ষমতা কী? শক্তি কোথায় তার? আছে কি আদৌ কিছু? আদিকাল থেকে শুনে আসছি বহু কথা : 'পেন ইজ মাইটার দ্যান দা সোর্ড'। অসির চেয়ে মসীর শক্তি বেশী! কোথায় কীভাবে? গ্রীক ট্রাজেডী, মহাকাব্য বা সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমন্ডলে পরিভ্রমণের প্রয়োজন নেই। আমরা জানি, আমেরিকার সাহিত্যে *আংকল টমস কেবিন* ক্রীতদাসদের মুক্ত করতে, উনিশ শতকের বাংলায় *নীলদর্পণ* নাটকে নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ করতে যেমন সহায়ক শক্তিরূপে দেখা গিয়েছিল তেমনি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা পরাধীনতার অর্গল মুক্ত হতে আমাদের অসামান্যভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এভাবে বিশ্বসাহিত্যে অনেক অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। প্রতিবাদী উচ্চারণে, প্রতিরোধের প্রক্রিয়ায় প্রচন্ড পরিস্থিতি নির্মাণে সাহিত্যকে কখনো কখনো কার্যকর হতে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

প্যারিস, ১৯৬৪ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ছাত্র-অধ্যুষিত 'কার্তিয়ে লাত্যাঁ' তথা লাটিন কোয়ার্টারে একসময় অনেক পোস্টার-ব্যানার দেখা গেল : "ক্য প্য লা লিতেরাত্যুর" সাহিত্য কী করতে পারে? ক্লার্তে শীর্ষক বামপন্থী ছাত্রদের একটি পত্রিকার সাহায্যার্থে একটি সাহিত্যসভা হবে এক সন্ধ্যায়, খুব বড় একটা হলে এবং বেশ মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে টিকেট ক্রয় করে আলোচনা শুনতে হবে। অনুষ্ঠানের মধ্যমনি হলেন সদ্য নবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যানকারী স্বনামধন্য সাহিত্যিক-দার্শনিক জঁ -পল সার্ত্র। ডক্টরেটের জন্য অভিসন্দর্ভ জমা দেবার শেষ পর্যায়ে ব্যস্ততার কারণে বর্তমান লেখকের পক্ষে সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া সম্ভব

হয়নি। গিয়েছিলেন বন্ধু কাজী ওয়াহিদউল্লাহ। সেই অনুষ্ঠানের আলোচনা সভার বিবরণ শোনা হয়েছিল এবং অবশেষে সান্ত্বনা-স্বরূপ ১২৮ পৃষ্ঠার ছোটখাট একটা বই সংগ্রহ করা হয়েছিল যাতে রয়েছে ছয় জনের বক্তৃতা এবং একজনের ভূমিকা। আজ চার দশক পরও বইটি হারিয়ে যায়নি, সম্ভবত বিষয়টির গুরুত্বের কারণে!

এ বিষয়ে ভবিষ্যতে কখনো হয়তো বিস্তারিত লেখা যাবে। আপাতত বইটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে, সিমন দ্য বোভোয়ার সম্পর্কে লিখতে গিয়ে । দেখলাম এখানে এমন একটা ডিসকোর্স রয়েছে যা খুব পরিচিত নয়,অথচ গুরুত্বপূর্ণ। 'সাহিত্য কী করতে পারে'? শীর্ষক সেমিনারে অন্যতম অংশগ্রহণকারী সিমনের বক্তৃতাটি প্রকাশিত হয়েছে উপর্যুক্ত গ্রন্থের ৭৩ থেকে ৯২ পৃষ্ঠার। বইটির সাইজ ছোট এবং টেক্সটও কম স্পেসে ছাপা। তাই এটি খুব বড় নয়। সার্ত্রের বক্তৃতাটি আছে ১০৭ থেকে ১২৭ পৃষ্ঠার মধ্যে। অর্থাৎ প্রায় একই পৃষ্ঠা সংখ্যা কিংবা শব্দ-ব্যবহারে দুটি লেখা মুদ্রিত। অবশ্য কোন বক্তৃতার কী গুরুত্ব তা নিয়ে এখানে আমরা বক্তব্য উপস্থাপনা করবো না। আমরা শুধু সিমন দ্য বোভোয়ার এর বক্তৃতা যথাসম্ভব মূলানুগ অনুবাদে উপস্থাপন করবো। খুব সামান্য অংশ অপ্রয়োজনীয়বোধে বাদ দেওয়া হয়েছে। এসব অংশে অন্য অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক মন্তব্য রয়েছে।

...

আমার জন্য সাহিত্য এমন এক ক্রিয়াকর্ম যা মানুষের দ্বারা এবং মানুষের জন্য পরিচালিত। এতে তাঁদের কাছে বিশ্ব উন্মোচিত হতে পারে – এই উন্মোচনও যেখানে একটি ক্রিয়া বিশেষ।

একটি প্রশ্ন আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। সেটি হল, সাহিত্যের সঙ্গে তথ্যের সম্পর্ক। সেটি আজ স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত যেহেতু তথ্যের সকল উপকরণ বর্তমান কিছুটা অবহেলাচ্ছলে গ্রহণ করা হয়েছে বটে কিন্তু

টেলিভিশন, রেডিওকে ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুলো খুব বড় ধরণের জনসংখ্যাকে তথ্যপ্রদানে সক্ষম।

তাছাড়া ইতোমধ্যে আমাদের হাতের নাগালে রয়েছে সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, তুলনামূলক ইতিহাস, এমন সব দলিল যা জনগণকে আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি তার সম্পর্কে জানাবে। এবং এটা বাস্তব সত্য যে, এ ধরণের বইপুস্তকের প্রতি জনসাধারণের বড় রকমের আগ্রহ রয়েছে। তাঁরা কমবেশি সাহিত্য গ্রন্থ থেকে এদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে থাকছেন।

এটা কি সাহিত্যকর্মের দোষ না আমাদের বিশ্বে সাহিত্যের আর কোন স্থান নেই? এই প্রশ্নের প্রতি আপনাদের সঙ্গে আমি একটু দৃষ্টিপাত করতে চাই যা সংক্ষেপে – "সাহিত্য কী করতে পারে" এই প্রশ্নের এক রকমের জবাব হতে পারে বৈ কি!

একটা সন্দেহ আমার মনে দানা বাঁধে। বিশেষভাবে গেল বৎসর যখন আমি একটা বই পড়ি – যা আপনারাও অনেকে হয়তো পড়েছেন এবং সে বইকে আমি খুবই উল্লেখযোগ্য মনে করি। সেটি হল, 'সানচেসের সন্তানেরা'।

এটি হল মেক্সিকোর বস্তিতে পরিচালিত একজন মার্কিন সমাজ-বিজ্ঞানীর গবেষণার ফসল, প্রায় আট বছর ধরে, প্রথমে দীর্ঘস্থায়ী অবস্থান এবং পরে যাওয়া-আসার ভেতর তিনি একটি পরিবারের পিতা ও চার পুত্রের অস্তিত্বের কাহিনী টেপ রেকর্ডারে ধারণ করেছেন। এই কাহিনী বিভিন্নভাবে খন্ড খন্ড করে বহু মাত্রায় উপস্থাপন করে – যেমন কিছু ঔপন্যাসিক অনুসন্ধান করেন এবং সফল হন, তেমনি এই তথ্য সমূহ সমাজবিজ্ঞানের অধিক সংখ্যক গ্রন্থেও মিলবে কিন্তু সাধারণত শুধু একটি দৃষ্টিকোন থেকে সেখানে তথ্য প্রদান করা হয়ে থাকে। আর এই বইতে রয়েছে এক বিশাল বস্তুসম্ভার-মনস্তত্ত্ববিদ, সমাজবিজ্ঞানী এবং নৃবিজ্ঞানী এবং অন্য যাঁরা বিশ্ব এবং মানুষ সম্পর্কে আগ্রহী, তাঁদের সবার জন্য।

আমি নিজেকে প্রশ্ন করি : "যদি এ ধরণের বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় – যা প্রযুক্তিগতভাবে সম্ভব, যদি এভাবে অনেক রচনা আমাদের শহর, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ, বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার রহস্য উন্মোচিত করে, তাহলে সাহিত্যের কি আর কোন ভূমিকা পালন করা সম্ভব"?

আমি নিজেই নিজেকে জবাব দিই, 'হ্যাঁ, সম্ভব'। যদি বিশ্ব একটি সমগ্রতা রূপে বিবেচিত হয়, যদি এটা একটা সত্তা হয়, কিছু যদি আমরা পরীক্ষা করতে পারি, ভূ-গোলক অনুসারে আমরা যদি গোটা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পারি, যদি দেখতে পারি তার ঐক্যের মধ্যে পৃথিবীর সমগ্রতা। তাহলে তখন কোন বিষয় হবে গুরুত্বপূর্ণ? এককভাবে পৃথিবীর নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞান সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে বর্দ্ধিত করা কিংবা তাকে অনেক বড় আকারে আবিষ্কার করা সম্ভব – এ নিঃসন্দেহে এটিই।

কিন্তু যাকে বলা হয় অস্তিত্ববাদী দর্শন এবং আমি যার দলভুক্ত মানুষ তার ধারণায় এবং সার্ত্রের মতে, বিশ্ব হচ্ছে এক অসমগ্র সমগ্র। (une totalit'e de'totlisée).

তার মানেটা কী? তার মানে হল, একদিকে আছে বিশ্ব যা আমাদের সবার জন্য প্রায় এক রকম, অন্যপক্ষে আমরা সবাই একে অন্যের সঙ্গে অবস্থানগত পার্থক্যে রয়েছি। এই অবস্থান হলো আমাদের অতীত, আমাদের শ্রেণী, আমাদের অবস্থা, আমাদের প্রকাশ সমূহ, এবং অবশেষে সব মিলিয়ে যা তৈরী করে আমাদের স্বাতন্ত্র্যতা।

প্রতিটি অবস্থান একভাবে অথবা অন্যভাবে সমস্ত বিশ্বকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এটা অজ্ঞতাকেও আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে। আজ ভারতের অমুক শহরে কী ঘটছে তা আমার অজানা এবং এটা হচ্ছে প্যারিসে বসবাসরত ফরাশিরূপে আমার অবস্থান যার মধ্যে আমি বেঁচে আছি।

তাই বিশ্বকে সংসৃষ্ঠ করে আচ্ছন্ন করা যেমন একথা বলা যাবে না যে কেউ বিশ্বকে জানে। কিন্তু কেউ তাকে প্রতিফলিত করে, কেউ তাকে

সংক্ষিপ্ত করে দেখে বা কেউ তাকে প্রকাশ করে – যাকে লিয়েবনিজ বলেছিলেন, বিশ্বকে প্রকাশ করা।

এই যে বিশ্বের ঐক্য আমরা প্রকাশ করে থাকি এবং এই যে অনন্যতা, এই দৃষ্টিকোনের সমগ্রতা কিংবা তার বিরোধীভাব যা আমরা তার ওপর আরোপ করে থাকি অথবা বরং তার বিপরীতে আমরা নিজেদের অবস্থান খুঁজে পাই। কেননা দৃষ্টিকোণ কথাটা একটু যেন আদর্শবাদী। এটা যথার্থভাবে, যা একান্তই প্রয়োজনীয়, তাকেই নির্ণয় করে মানব পরিস্থিতিতে এবং বিশ্বের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে।

এখানেই তাহলে সাহিত্য খুঁজে পাবে তার যৌক্তিকতা এবং তার তাৎপর্য। কেননা এসব অবস্থান একে অন্যের উপর আবদ্ধ নয়; আমরাও মোনাত (আদি স্বতন্ত্র জীব) নই। প্রত্যেকটি অবস্থান অন্যের জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, বিশ্বের উপরও তাই। এসব অবস্থানের বদলে যাওয়া ছাড়া অন্য কিছুই নয়। এরা একে অন্যকে আবদ্ধ করে রাখে।

তাহলে আমরা যোগাযোগ করতে পারি; আমরা বিশ্বময় যোগাযোগ করতে পারি যা একটি সমগ্রতা, যদিও অসমগ্র হয়ে, এই বিশ্ব আমাদের সবার জন্য অস্তিত্ববান এবং আমাদের শুনবার জন্য অনুমতি দিয়ে থাকে, যেমন আমরা সবুজ কী, লাল কী – এসব বুঝতে পারি।

আমরা আমাদের শুনতে পাই এবং যোগাযোগে সক্ষম হই। আমি তাঁদের একজন নই যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, দৈনন্দিন জীবনেও কোনো যোগাযোগের অস্তিত্ব নেই। আমি মনে করি, আমরা যখন একত্রে কোনো লক্ষ্যে কিছু করতে যাই অথবা আমরা কথা বলি, তখনই আমরা যোগাযোগ করে থাকি।

আমি মনে করি, এই মুহূর্তে আমরা যোগাযোগ করে যাচ্ছি যা আমার বলার কথা এবং যা আপনারা শুনতে পাচ্ছেন; এর মধ্যে একটা সত্যকার সম্পর্ক রয়েছে যা ভাষার দ্বারা সৃষ্ট; এটা হচ্ছে একটা দৃষ্টিগ্রাহ্য ব্যাপার এবং এটা এক তাৎপর্যের হাতিয়ার, সবার হাতের নাগালে এর স্থিতি।

অবশ্য এই যোগাযোগের অভ্যন্তরে আছে একটা বিচ্ছেদ যা অবশ্যম্ভাবী। যে আমি কথা বলছি তার সঙ্গে যে আপনি শুনছেন, আমরা একই অবস্থানে নেই।

আর যাঁরা শুনছেন তাঁদের একজনও তাঁদের প্রতিবেশীর সঙ্গে একই অবস্থানে নেই। তিনি একই অতীত নিয়ে জীবনপাত করেননি, একই উদ্দেশ্যে, একই সংস্কৃতি নিয়ে এখানে আসেননি। সবাই পৃথক; এই সব অবস্থান একরকমভাবে একে অন্যের ওপর উন্মোচিত হয় এবং নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে, তথাপি কিছু বিষয় যোগাযোগের বাইরে থেকে যায় সম্মেলন, আলোচনা, বিতর্কের মাধ্যমে যার সুরাহা করা হয়।

আমাদের অবস্থানের অনন্যতার কারণে কিছু বিষয় কখনো অবোধ্য থেকে যায়। কিন্তু একই সঙ্গে এই বিচ্ছেদের মধ্যেও রয়েছে যোগাযোগের সূত্র। আমি বলতে চাচ্ছি যে, আমি এক কর্ত্রী যিনি বলেন, "আমি" আমিই আমার পক্ষে একমাত্র কর্ত্রী যিনি বলেন, আমি, এবং তা আপনাদের জন্য একই বিষয়।

আমি মরে যাব – এমন এক মৃত্যু যা আমার জন্য সর্বতোভাবে অনন্য। কিন্তু তা আপনাদের প্রত্যেকের জন্যও একই ব্যাপার। প্রত্যেকের জীবনে এক অনন্য রুচিবোধ রয়েছে। একইভাবে অন্য কেউ জানতে পারে না। কিন্তু তা সবার জন্য একই বিষয়।

আমি মনে করি, সাহিত্যের সৌভাগ্য এখানে যে, তা অন্যদের যোগাযোগের মাধ্যমকে অতিক্রম করতে পারে এবং আমাদের জন্য সম্ভব করে তোলে সেই যোগাযোগ যার থেকে আমরা আলাদা হয়ে রয়েছি।

সে হচ্ছে, বিচ্ছেদকে নিশ্চিত করে তাকে অতিক্রম করবার একটা পদ্ধতি। কারণ যখন আমি একটা বই পড়ি-একটি বই যা আমার পছন্দ, তখন কেউ যেন আমার সঙ্গে কথা বলে। সাহিত্য শুরু হয় কেবল তখন থেকেই, যখন একটি অনন্য কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পাই।

বস্তুত, ভাষার প্রতি আমরা অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি যা আদৌ বলা হয় না; যদি একটা কণ্ঠস্বর না থাকে তাহলে তা আর সাহিত্য হল না। তাই, একটা ভাষা একজন চিহ্ন বহন করে থাকে। প্রয়োজন -একটা ভাষাভঙ্গী, একটা স্বরগ্রাম, একটা টেকনিক, একটা শিল্প, একটা আবিষ্কার – যা লোকভেদে তৈরি করে একেবারে ভিন্ন বস্তু; এটা প্রয়োজন এই জন্য যে, একজন আমার ওপর তাঁর উপস্থিতির প্রাধান্য বিস্তার করেন এবং একই সঙ্গে তিনি আমার ওপর তাঁর বিশ্বকে চাপিয়ে দেন।

বিগত বছরগুলোতে অনেক আলোচনা হয়েছে লেখকের সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক বিষয়ে। .... প্রশ্নটি সঠিকভাবে উত্থাপিত হয়না। বাস্তবতা কোনো বরফ-ঠান্ডা সত্তা নয়; এটা হয়ে -ওঠার ব্যাপার, আমি পুনরুক্তি করে বলতে চাই যে, এটা হচ্ছে অনন্য অভিজ্ঞতাসমূহের সম্মিলন যা বিচ্ছিন্ন থেকেও একে অন্যকে আচ্ছন্ন করে রাখে। তাহলে এটা অসম্ভব ব্যাপার যে, একজন লেখক বাস্তবতাকে একটা নির্ধারিত দৃশ্যে নামিয়ে রাখবে, শেষ হয়ে গেল এবং তা তার সমগ্রতার মধ্যে প্রদর্শন করতে পারবে। আমরা প্রত্যেকে শুধু একটি মুহূর্তকে একটি আংশিক সত্যকে ধরে আছি : একটি সত্যের অংশবিশেষ হল এক রহস্যমন্ডিত কর্ম যদি তা সমগ্র সত্যরূপে নিজেকে গণ্য করে থাকে। যদি নিজে যা তা বলে নিজেকে প্রকাশ করে , তাহলে তা একটা সত্য এবং তা যার সঙ্গে যোগাযোগ করবে তাকে সমৃদ্ধ করে তুলবে।

একদা বিশ্ববীক্ষা নিয়ে কথা হতো। ভালো, এটা একটা আদর্শবাদী অভিব্যক্তি। এ কারণেই এটা বিরক্তিকর, যেন বিশ্বের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সহজভাবে তার বিবেকের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে গেল, যেন তাকে এক বা অন্য দৃষ্টিকোন থেকে প্রত্যক্ষ করা গেল।

কিন্তু আমরা যদি অবস্থানের কথা বলি, তাহলে আমরা বিশ্বের এক অনন্যতার ধারণা আবার গ্রহণ করতে পারি, যা প্রত্যেক লেখকের দ্বারা

প্রতিটি লেখকের কাছে প্রস্তাবিত। তিনি প্রকাশ্যে যে বিশ্বকে উপস্থাপন করেন তাকে, তারই সারাৎসারে তিনি নিজেকে জড়িয়ে রাখেন।

আমার অভিমত হলো যে, শুধুমাত্র খুব সরলমতি পাঠক অথবা শিশু ব্যতিরেকে কেউ বিশ্বাস করেন না যে কোনো বইয়ের মাধ্যমে তারা সুষ্ঠু পদক্ষেপে বাস্তবতার জগতে প্রবেশ করতে সক্ষম। আমি যখন 'ফাদার গোরিও' পড়ি তখন আমি ভালো ভাবেই জানি যে আমি বালজাকের আমলের প্যারিসে ঘুরে বেড়াচ্ছি না। আমি বালজাকের উপন্যাসে, বালজাকের জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

এভাবে যখন আমি স্তঁধাল পড়ি, তখন আমি ফাব্রিসের ইতালী নয়, আমি দেখি স্তঁধালের ইতালী।

আসলে এটার খুব গুরুত্ব নেই যে, গ্রন্থকার ভাবছেন তিনি যথার্থ এক বাস্তবতাকে তুলে এনেছেন অথবা তিনি সমালোচনা করছেন এবং তিনি বুঝতে পেরেছেন যে তিনি বিশ্বে অবস্থানগত পরিস্থিতিতে রয়েছেন। তিনি আমাদের কাছে এমন এক বিশ্বকে তুলে এনেছেন যে -বিশ্ব তাঁর কাছে উঠে এসেছে। যা হোক, পাঠকরূপে আমার কাছে প্রয়োজনীয় মনে করি সেই অনন্য বিশ্বকে যা আমাকে বিমুগ্ধ করে। আমারটির সঙ্গে তাকে আবার একত্র করে দেখি, অথচ তা ভিন্ন।

এতে তার চিহ্নিতকরণের প্রশ্ন আসে। আজকের সাহিত্যে একটা প্রবনতা রয়েছে যা চরিত্রকে চিহ্নিতকরণের ব্যাপারটাকে অস্বীকার করে এবং যা আরো গুরূতরভাবে একেবারে চরিত্রকেই অস্বীকার করে ফেলে।

কিন্তু আমি এই আলোচনাকেও নিরর্থক মনে করি কেননা সঠিকভাবে কোনো চরিত্র থাক বা না থাক, পাঠের অগ্রগতির কারণে আমি চাইবো আমি কার সাথে নিজেকে চিহ্নিত করি, এবং সে হচ্ছে স্বয়ং লেখক। আমার প্রয়োজন তাঁর বিশ্বে প্রবেশ এবং তাঁর বিশ্বটি যেন আমার বিশ্বে পরিণত হয়।

তথ্যের সঙ্গে মৌলিক পার্থক্যটা ঠিক এখানেই। আমি যখন *সানশেজ - এর সন্তানেরা* বইটি পড়ি, তখন আমি আমার বাড়িতে থাকি, আমার কক্ষে, আমার যাপিত জীবনের একটা তারিখে, আমার বয়সের সঙ্গে, আমার চারদিকের প্যারিসের সঙ্গে; মেক্সিকো অনেক দূরবর্তী তার বস্তি নিয়ে এবং যে শিশুরা সেখানে বাস করে এবং আমি তাদের সম্পর্কে আগ্রহী, আমি তাদেরকে আমার জগতের সঙ্গে সংযুক্ত করি এবং কিন্তু আমি জগত বদলাই না।

যখন কিনা কাফকা, বালজাক, রব-গ্রিয়ে আমাকে পেতে চান, অবস্থান করার জন্য রাজী করান, অন্তত একটি মুহূর্তের জন্য, অন্য একটা বিশ্বের প্রাণকেন্দ্রে। আর এটাই তো হলো সাহিত্যের অসাধ্যসাধন এবং এটাই সাহিত্যকে তথ্য থেকে আলাদা করে; এতে অন্য একটা সত্য আমার হল, তার ভিন্নতা বর্জন না করেই। আমিও পরিহার করলাম আমার "আমিত্ব" যিনি কথা বলছেন তাঁর পক্ষে গিয়ে; তথাপি আমি আমারই থাকলাম।

এটা এমন এক সংশয় যা বারবার আসে , বারবার পরাজিত হয়। এটাই একমাত্র যোগাযোগের উপাদান – যা আমাকে যোগাযোগ – অসাধ্যকে এনে দিতে সমর্থ – যা আমাকে অন্য একটা জীবনের রুচি এনে দিতে সক্ষম। আমি এমন এক বিশ্বে নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ি যার রয়েছে নিজস্ব মূল্যবোধ, নিজস্ব রঙ; আমি নিজেকে তার সঙ্গে সংযুক্ত করছি না এটা আমার থেকে আলাদাই থাকছে, তথাপি এটা আমার জন্যই অস্তিত্ববান, এটা অন্যদের জন্যও অস্তিত্ববান যাঁরা তার থেকে বিচ্ছিন্ন এবং যাদের সঙ্গে আমি যোগাযোগও করে থাকি। আমি তা করি বইয়ের মাধ্যমে এবং তাতে আমরা অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ি।

প্রুস্ত এজন্যই চিন্তা করেছেন যে, আন্ত-র্ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিশেষাধিকার প্রাপ্ত স্থান হল সাহিত্য। তাঁর এই চিন্তা যুক্তিসংগত।

আমার মতে, যখনই কোন লেখক একটি সত্যকে তুলে ধরতে এবং প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন তখনই জন্ম হয় সাহিত্যকর্মের; বিশ্বের সঙ্গে সেই

সত্যের এবং তার নিজের বিশ্বের সম্পর্কই এখানে কাম্য। কিন্তু এই শব্দগুলোর তাৎপর্য কী তা বোঝা দরকার : কিছু বলার বিষয় থাকতে হবে – এটা এমন একটা বস্তুর অধিকারী হওয়া নয় যা একটা থলেতে বহন করা যাবে এবং পরে টেবিলের ওপর বিছিয়ে নিয়ে শব্দ খুঁজে তার বর্ণনা করা হবে।

সম্পর্ক এমনি এমনি হয় না যেমন বিশ্ব এমনি এমনি হয়নি এবং লেখকও এমনি এমনি হননি। এটা শুধু একটা সত্তা নয়, বরং একটা অস্তিত্ববান, যিনি স্বয়ং নিজেকে অতিক্রম করেন, যাঁর একটা 'প্রাক্সিস' (বাস্তবসম্মত পথে কাজ করার বিশ্বাস রয়েছে) আছে এবং যিনি কোনো সময়ের মধ্যে বসবাস করেন। এই যে বিশ্ব যা এমনি এমনি হল না, তা এখন এমন একটি ব্যক্তির সামনে যিনিও এমনি এমনি আসেননি। তাঁদের সম্পর্কটা স্বভাবতই নির্দ্ধারিত নয়। একে আবিষ্কার করে নিতে হয়। একে অন্যের কাছে আবিষ্কার করে দেবার আগে লেখকের পক্ষে তাকে আবিষ্কার করে নিতে হয়; এবং সেজন্য সব সাহিত্যকর্ম মূলত একটি অনুসন্ধান।

এর সঙ্গে মিলে যায় লুকাক্সের ধারণা যিনি বলতেন যে, উপন্যাসের নায়ক হচ্ছে মূল্যবোধসন্ধানী এক সমস্যাসংকুল সত্তা; আর আবার ফিরে আসি রব-গ্রিয়ের কাছে যিনি গেল বছর লেনিনগ্রাদে বলে এসেছেন যে, "আমি কেন লিখি সেটা জানতেই তো আমি লিখে থাকি"। উপন্যাস, আত্মজীবনী, প্রবন্ধ এমন কোন সাহিত্যকর্ম নেই যা এই অনুসন্ধানের বাইরে ।

সমালোচকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে থাকেন – যখন তাঁরা যে লেখকের বই পড়ছেন তাঁর চেয়ে বেশি চালাক ভাবছিলেন, "মসিয় অথবা মাদাম অমুক পুরোপুরিভাবে প্রতারিত হয়েছেন, তিনি একেবারে পরাস্ত হয়েছেন, তিনি করতে চেয়েছিলেন এক বই, করে ফেলেছেন অন্য বই"।

ভালো, সমালোচক ভাগ্যবান তিনি আগে ভাগে জানেন লেখক কী করতে চেয়েছেন । কেননা লেখক ভেবেছেন যে তিনি এটা করবেন এবং

করে ফেলেছেন অন্যটা তা নয়, আসলে তিনি জানতেন না কোন্ বই তিনি করতে যাচ্ছেন। তাঁর শুধু একটা অনুসন্ধানসূত্র ছিল যার ফলাফল সবসময় কিছুটা অপ্রত্যাশিত। সেজন্য ভিৎ আর আকৃতির পার্থক্য গেছে ঘুচে এবং এ দুটো অবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

(একজন লেখক বলেছেন যে) অনুসন্ধান আকৃতির দিকে বিষয়বস্তুর দিকে স্বতঃই প্রভাব বিস্তার করে। যদি কোনো নির্ধারিত বিষয়বস্তু থাকে যাকে শব্দ দিয়ে আচ্ছাদিত করা যায়, যেমন একটি চকোলেটকে আচ্ছাদিত করা হয়, তাহলে আকৃতি অনুসন্ধানের কোনো মূল্য নেই।

বৈজ্ঞানিক বইপত্রে একজন গ্রন্থকার অগ্রিম তাঁর বিষয়বস্তু পেয়ে থাকেন। তাঁর কার্ড আছে, নোট আছে, তিনি একটা ইতিহাসের বই লেখেন কিংবা অংকের। তিনি বিষয়বস্তুর পরিচ্ছন্ন বিন্যাস এবং সহজ ছাড়া অন্য কিছু খোঁজেন না। যে সম্পর্কে তাঁকে বলতে হবে এবং যা সেখানে আছে সবই তাঁর কাগজের ভেতর রয়েছে খসড়া পর্যায়ে, এখন তাঁকে শুধু পরিস্কারভাবে বলতে হবে এবং তাতেই হয়ে যাবে।

এর ওপর আছে সাহিত্য ব্যবসায়ী, নকল সাহিত্যের ব্যবসায়ী, তাঁদের রয়েছে একটা ইতিহাস, সব হাতের নীচে বানানো। তারপর একটা সুন্দর, যুগোপযোগী প্রচ্ছদ – পছন্দ করে নেন যা তাতে খাপ খায়। কিন্তু, এটাও তো সাহিত্য নয়।

একজন গ্রন্থকার নিজেকে খুঁজে থাকেন এমন একটা খাঁটি সাহিত্যকর্মে যার অনুসন্ধান বৈশ্বিক। বলার কায়দাটাকে যা বলা হয়েছে তার থেকে আলাদা করা যাবে না। কেননা বলার কায়দা হচ্ছে এই অনুসন্ধানের ছন্দ। এটা হচ্ছে তাঁকে সজ্ঞায়িত করবার কায়দা, তাঁর বেঁচে থাকার ভঙ্গী। কাফকার 'রূপান্তর' (লা *মেতামরফোজ*) এবং 'বিচার' (*লে প্রসে*) কোনো রূপায়িত প্রতীক নয়, বরং এটা কাফকার কায়দা বিশেষ যা তিনি নিজের ও পাঠকের জন্য বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট ছিলেন এবং যাতে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অভিজ্ঞতার সত্যতা।

কাফকা নাকি বলেছিলেন যে, তিনি সাহিত্যের জন্য বেঁচে আছেন। সার্ত্রও একই কথা বলবেন এবং সার্ত্রের জন্য সাহিত্য ভাষার মাত্র অনুশীলন নয়।

সর্বতোভাবে যখন কাফকার কায়দা সম্পর্কে বলি – যখন তিনি একটা কাহিনী বলেন, অথবা প্রুস্ত-এর একটা বাক্য বিন্যাস, বা জয়েস-এর 'ইন্টেরিয়র মনোলগ' সম্পর্কে ভাবি তখন অনুভব করি, এগুলোর সবটাই একেবারে বিচ্ছিন্নতা-অযোগ্য। তাঁরা যে উপকরণ ব্যবহার করেন, এবং যে অনুসন্ধান তাঁরা চালিয়েছেন, (প্রুস্ত ব্যাখ্যামূলকভাবে যার সম্পর্কে বলেন কিন্তু যা সবারই ক্ষেত্রে খাটে) তাদের সাহিত্যকর্ম। যখনই একটা অনুসন্ধান এবং আবিষ্কার তখনই একটা সত্যতা এবং একটি সাহিত্যকর্ম।

এসব বলার পরও কথা থাকে। যে-কোন অনুসন্ধান এবং যে-কোন আবিষ্কার একইরকম তাৎপর্য বহন করে না; আমরা প্রত্যেকেই সমগ্র বিশ্বকে প্রকাশ করে থাকি। সেটা হতে পারে অপ্রকাশ্যত। সেটা হতে পারে অজ্ঞনতার অন্ধাকারে, নানা রহস্যের সূত্র ধরে। এটা হতে পারে রহস্যাবৃত-রহস্যময়ী; সেটা হতে পারে বিচ্ছিন্নতার বিষয় নিয়ে। বহুভাবে বিশ্বকে প্রকাশ করা সম্ভব, যাদের মধ্যে কিছু রয়েছে যা ব্যাখ্যার অনুমতি দেয় না, যা একটা সত্য দিয়ে আমাদের ঘিরে রাখে।

এভাবেই আমি দায়বদ্ধ সাহিত্যের ধারণাটিকে ফিরে পাব। সে ব্যক্তি তাঁর যুগে দায়বদ্ধ হয়ে পড়েন, যিনি কোনো কর্মপন্থা, যেমন একটি ঘৃণ্য বিষয় অথবা বিদ্রোহ দ্বারা ইতিহাসকে পৃথক করে নিতে পারেন। বিশ্বের সঙ্গে তাঁর অনেক গভীর ও অর্থবহুল সম্পর্ক রয়েছে যা বিশ্বের একপাশে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন কোনো এক গজদন্ত মিনারে।

একজন লেখক তাঁকে যা সত্যি সত্যি আগ্রহী করে তাছাড়া অন্য কিছুতে আগ্রহী হতে পারেন না। যদি তাঁর আগ্রহের ক্ষেত্র হয়ে পড়ে সংকীর্ণ ও দুর্বল তিনি আমাদের দেবেন একটা সমৃদ্ধিহীন জগৎ; তখন

তিনি আমাদের সঙ্গে এমন এক যোগাযোগ স্থাপন করবেন যা হবে খুবই সীমাবদ্ধ এবং খুবই গরিবী কায়দায়।

আমি দায়বদ্ধ সাহিত্যের ব্যাপারে বেশি কিছু বলতে চাই না কারণ এ বিষয়ে অনেকে অনেক কথা বলেছেন এবং আমি এসব বক্তব্যের সঙ্গে অনেকাংশে একমত।

আমি বরং আজ পছন্দ করব আপনাদের কিছু বলতে – যাতে আমি আগ্রহী এবং সে হল : লেখকরূপে সাহিত্য আমার জন্য কী করতে পারে? এভাবেই তো মূল প্রশ্ন "সাহিত্য কী করতে পারে"? তার একধরণের জবাব দেয়া যাবে।

একটু আগে আমি বললাম যে, বিশ্ব হয়ে পড়েছে সমগ্রতাশূণ্য; কিন্তু আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতাও হল সমগ্রতাশূণ্য। একটা সমগ্রতা যে নির্মিত হচ্ছিল কিন্তু কখনও পূর্ণতা লাভ করেনি এবং যা হয়েছে তাও রইলো আমাদের নাগালের বাইরে। যেহেতু বিবেক সব সময় অতিক্রমশীল এবং নঙর্থক, আমরা কোনো মুহূর্ত প্রশান্তিতে বসবাসে অসমর্থ, আমরা সব সময় অসুখী আর আনন্দহীনতায় থাকি।

একটা ইমোশন যা একটা সেন্টিমেন্ট বা একটি বিষাদ অথবা আনন্দ কমবেশি দীর্ঘ সময় আমাদেরকে ঘিরে থাকে। কিন্তু সেভাবেই তা অন্তর্হিত হয়। আমরা কোনোভাবেই তাদের চিরস্থায়ী করতে অসমর্থ।

অন্যদিকে – যা অনেক বেশি বিদ্রোহাত্মক সে হল, কোনো ইমোশন বা কোনো চিন্তাধারা আমাদের সার্বিক অভিজ্ঞতাকে ধরে রাখতে পারে না; সুখ দুঃখ, দোদুল্যমানতা, বৈপরীত্য ওগুলির একই সঙ্গে আমাদের মানব পরিস্থিতির সত্যতা। এটা আমাদের যাপিত অভিজ্ঞতার বাইরে থেকে যায়।

আর এটা বিশ্বাস করার প্রয়োজন নেই যে স্মৃতি আশ্চর্য কিছু ঘটিয়ে দেবে। স্মৃতি নিজেই মুহূর্তকে আবার বাঁচিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়ে পড়ে, তাকে সুখ দিতে, মুহূর্তকে বিভিন্নভাবে একত্র করতে অসমর্থ হয়ে পড়ে।

একটাই শুধু উপায় আছে যাতে তাকে তার চূড়ান্ত পর্যায়ে না যেতে হয়। মৃত্যু-যন্ত্রণা অথবা পরিত্যক্ত হবার বেদনা কিংবা কোনো সাফল্যের আনন্দ, বা কন্টকাকীর্ণ শ্বেত পুষ্প দর্শনে পরিতৃপ্ত একজন যুবকের অনুভূতিকে প্রকাশ করতে। একমাত্র সাহিত্যই সুবিচার করতে পারে মুহূর্তের এই চরম উপস্থিতিকে আমাদের সামনে তুলে ধরতে। মুহূর্তের এই চিরন্তনতাকে আর কখনো পাওয়া যাবে না। এবং একমাত্র সাহিত্যই পারে একত্রে একটি সৃষ্টিকর্মে অবস্থান করতে যা একটি সমগ্রতা – এই শ্বেত পুষ্প এবং একটি দাদী -মার মৃত্যু। একমাত্র সাহিত্যই পারে একটি মানব অভিজ্ঞতায় বিরোধাভাসপূর্ণ মুহূর্তগুলোকে বিরোধ-মুক্ত করতে।

শব্দ এভাবে সময়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছে, চলেছে মৃত্যুর বিপরীতে। কিন্তু বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করে চলেছে শব্দ। কেননা শব্দের সে শক্তি রয়েছে। আমি মনে করি যে, এটাই আসলে শব্দের কর্মকান্ড যা সবচে 'প্রকাশ্য এবং সবচে' প্রয়োজনীয় – যা সবকিছুকে আমাদের মধ্যে অনন্য, যা সময়ের পরিবর্তনে আমাদের জীবনের রুচিবোধে, মৃত্যুতে – তাদের সার্বজনীনতায় প্রতিস্থাপন করে থাকে।

সাহিত্যক্ষেত্রে এক একজন লেখকের আগমন ঘটে এক এক ভিন্ন পথে। কিন্তু আমার মনে হয়, কেউ লিখতেন না, যদি একভাবে বা অন্যভাবে-বিচ্ছেদের বেদনায় ও আঘাতে তিনি আহত না হতেন, এবং যদি না একভাবে বা অন্যভাবে হোক, তাকে ভেঙ্গে ফেলার পদ্ধতি তিনি অনুসন্ধান না করতেন।

আমি ব্যক্তিগতভাবে ভালো করে জানি যে, যৌথ আনন্দের মুহূর্তে, সুখী যোগাযোগের মুহূর্তে, যেমন আমি অনুভব করেছি স্বাধীনতার দিনগুলোতে – আমার আদৌ কোনো ইচ্ছা ছিলনা লেখার; সাহিত্য, সেই সময়ে, আমার কাছে মনে হয়েছে অপ্রয়োজনীয়।

সাহিত্য অসম্ভব, শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়। কিন্তু অসম্ভব যখন কেউ চূড়ান্ত হতাশায় নিমজ্জিত হয়। কেননা হতাশা হচ্ছে এমন একটা বিশ্বাস

যেখান থেকে ফিরে আসার কোনো পথ নেই। এটা একটা সত্যতা। কিন্তু এই সত্যতার বিপরীতে কিছুই নেই অথবা কমপক্ষে এটা এভাবে স্বীকৃত নয়।

যদি কেউ কখনো চূড়ান্ত হতাশায় লিখতে না পারেন, অনুরূপ কিন্তু বিপরীতমূখী পারস্পরিক ভাবে বলতে পারেন যে তিনি হতাশায় সাহিত্য পেতে পারেন না। তবে তা খুব সাধারণভাবে কম স্বীকৃত।

বাস্তবিকই যদি কেউ বেদনাকে প্রকাশ করে থাকেন সে হচ্ছে, তিনি চান এই প্রকাশে তিনি একটি তাৎপর্য গ্রহণ করবেন। তিনি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তা নিয়ে তৎপর থাকেন। আমরা যদি এখনও যোগাযোগে বিশ্বাস করে থাকি, সেটা করি মানুষে এবং তাদের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসের কারণে।

আমি এটা বলছি কারণ সমাজবাদী আশাবাদের নামে আমাকে খুবই গালমন্দ শূনতে হয়েছে । আমার সর্বশেষ গ্রন্থ 'পরিস্থিতির চাপ'-এর শেষ ভাগের জন্য। আমাকে বলা হয়েছে : সময়ের অপসৃয়মান হতাশা, মৃত্যুর বিভীষিকা খুব ভালো। এসব অনুভব করবার অধিকার আপনার আছে, এটা খুব সম্মানজনক; এটা আপনার ব্যাপার ... আমাদের আর এসব শোনাবেন না। আমি বামপন্থীদের কাছ থেকে এ ধরণের উক্তিসহ চিঠি পেয়েছি।

ভবিষ্যতের ওপর আস্থার কারণ দেখিয়ে আমি বলিনা কেন যা লোকে ভাবে : একদা সমাজবাদী সমাজ হয়ে যাবে। প্রতিবন্ধকতা বা সারাজীবনের দুর্ভাগ্যের ব্যাপারে সেজন্য চুপ থাকতে হবে। অথবা আমি হয়তো সমাজবাদী আস্থাশীলতাকে প্রযুক্তিবিদদের আশাবাদের সঙ্গে মিল খুঁজে পাব না। আজ ভয়ানক ফলাফল ঘটিয়ে যা বহু রকমের দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত করেছে এবং যা ভবিষ্যতকে একটা অজুহাতরূপে ব্যবহার করে যাবে।

যদি বিচ্ছিন্নতা ব্যাপারটিকে সাহিত্য উপেক্ষা করতে চায় এত দূর গন্ডিতে যে, তাকে মনে হবে সবচে অনুপেক্ষনীয়। তাহলে তো সাহিত্যকে হতাশা, নির্জনতা, মৃত্যু নিয়ে কথা বলতে হবে। কেননা এগুলো যথার্থই অবস্থানগতভাবে আমাদের অনন্যতাকে শক্তভাবে আবদ্ধ করে রাখে। আমাদের জানা এবং সহ্য করা দরকার এবং এই অভিজ্ঞতাসমূহ অন্য সব মানুষেরও বটে।

ভাষা আমাদেরকে মানব সমাজের সঙ্গে পুনঃ সুসংহত করে থাকে। প্রকাশের জন্য খুঁজে পাওয়া বেদনাকে কোনভাবেই বাদ দেওয়া যাবে না। এতে এটা কম অসহনীয় হয়ে পড়বে। পরাজয়ের বদনাম, মৃত্যুর কথা বলতে হবে পাঠকদের হতাশ করার জন্য নয়। বরং তার বিপরীত কারণে অর্থাৎ হতাশা থেকে রক্ষা করার প্রয়াস হিসাবেই তা করা যাবে।

প্রত্যেক মানুষ অন্য মানুষের জন্য তৈরি হয়ে থাকে এবং ওদের বাইরে সে নিজেকে বুঝতে পারে না, তাদের দ্বারাই সে আলোকিত হয়ে থাকে।

আমি মনে করি, সাহিত্য এটাই পারে এবং সাহিত্যের এটাই দেয়া দরকার। সাহিত্যকে আমাদের একে অন্যের কাছে স্বচ্ছ করে তোলা উচিত। আরো অন্য কাজ রয়েছে , রয়েছে অন্যতর কর্মকান্ড : একশান, প্রযুক্তি, রাজনীতি ইত্যাদি। কিন্তু সর্বপ্রকারে এগুলো মানুষের জন্য নির্ধারিত থাকবে। এগুলো থেকে বিচ্যুত হলে বা অন্যদিকে ধাবিত হলে এগুলো হয়ে পড়বে উদ্ভট, এমনকি ঘৃণ্য।

মানুষের মধ্যে যে মনুষ্যত্ব রয়েছে তাকে প্রযুক্তির মারপ্যাঁচ এবং আমলাতান্ত্রিকতা থেকে রক্ষা করে বিশ্বকে তার মানবিক মাত্রায় নিয়ে এসে বহুমানুষের কাছে ব্যক্তিকে উন্মোচিত করা; তাদের সঙ্গে কখনো একত্রে, কখনো আলাদা ভাবে থাকা – আমি মনে করি যে, এটাই সাহিত্যের কাজ এবং এ কাজের জন্য তার আসন অপরিবর্তনীয়।

বার্ধক্য

এবারের ১লা অক্টোবর খবরের কাগজ পড়ে জানলাম এই দিনটি আর্ন্তজাতিক প্রবীণ দিবস। হয়তো আগেও দেখেছি কিন্তু খবরটা সম্ভবত মনে ধরেনি, মনেও রাখিনি। অথচ কাকতালীয়ভাবে খবরটা এসে পড়লো এমন দিনে যখন এ বিষয়ে কিছু লেখার কথা ভাবছি এবং শুরু করতে যাচ্ছি।

১৯৪৭ সাল থেকে নাকি জাতিসঙ্ঘ বয়স্কদের সম্পর্কে চালু করে তাদের কার্যক্রম। ইত্তেফাক পত্রিকায় ১লা অক্টোবর সংখ্যায় (২০০৭) উপসম্পাদকীয় নিবন্ধে সাগর চৌধুরী লিখেছেন, বিশ্ব সংস্থাটি ৬০ বছরকে বার্ধক্য হিসাবে চিহ্নিত করেছে। পৃথিবীতে নাকি ৬০ বছর বয়সী ৬০ কোটি মানুষ রয়েছে। সে হিসেবে বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৭ শতাংশ প্রবীণ। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের প্রবীণদের মধ্যে ৭৮ শতাংশ বিধবা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রবীণরা কোন-না-কোন ভাবে তাঁদের সংসারে অবহেলিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁরা বঞ্চিত এবং নির্যাতিত হন এমন অভিযোগও রয়েছে। তবে উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত পর্যায়ে এই হার কিছু কম। খাঁটি কথা। বাংলাদেশের বর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রবীণদের পরিস্থিতি হয়তো তুলনামূলকভাবে ততো খারাপ নয়। ভগ্ন-স্বাস্থ্য নিয়ে শয্যাশায়ী না হলে এদেশের বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার সংসারে নানা কাজকর্ম : রান্নাবান্না, ঘরঝাড়ু, শাকসব্জী, ক্ষেতখামার, সর্বোপরি শিশুপালন বা অল্পবয়স্ক বালক-বালিকার দেখভাল করা অনেকে তাঁদের কর্তব্য বলে মনে করেন। অবশ্য অধিকাংশ সময় তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচিতমত কাজ করে থাকেন। বিদেশে অবস্থানরত ছেলেমেয়েরা ইদানীং প্রায় তাঁদের মা-

বাবাকে তলব করে গৃহস্থালীর দায়দায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন। তবে উন্নত বিশ্বের জনগোষ্ঠীতে 'বার্ধক্য' বিষয়টি ক্রমবর্ধমান সমস্যারূপে চিকিৎসাবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও প্রশাসক-জনপ্রতিনিধিদের কাছে প্রতিভাত হয়েছে, যেজন্যে তাঁরা ষাটের দশক থেকে পত্রপত্রিকায় ও বিবিধ রচনায় এর সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করে চলেছেন। বহু নতুনতর ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। আমেরিকা ও ইউরোপে বেশ কিছু গবেষণা পরিচালিত হয়েছে বার্ধক্যের ফলে নরনারীর জীবনে উদ্ভূত নতুন ধরনের সমস্যাবলী চিহ্নিত করবার জন্য।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সিমন দ্য বোভোয়ার ১৯৭০ সালে লেখেন তাঁর *লা ভিয়েইয়েস* গ্রন্থটি। শিরোনামের বাংলা অর্থ 'বার্ধক্য'। ৪ঠা নভেম্বর ২০০৫ সালে প্যারিস পরিভ্রমণকালে একটি পুস্তকালয়ে গিয়েছিলাম সর্বনের শিক্ষক আলজেরীয় চিন্তানায়ক মোহাম্মদ আরকুনের 'মানবতাবাদ ও ইসলাম' বইটি কেনার উদ্দেশে। সেখানে অকস্মাৎ চোখে পড়লো সিমনের বইটি। একটু কম দামে বিক্রির জন্য রাখা বইয়ের শেলফে। কম দাম মানে? তাও আমাদের হাজার টাকা! নিজেই যখন সে বয়সের শিকার তখন বইটির অধিকারী হবার ইচ্ছা জাগলো। সিমনের লেখার প্রতি আগ্রহ তো বহুদিনের! তাছাড়া তাঁর লেখা এই বইটির অস্তিত্বের কথা আমার জানা ছিলনা পূর্বাহ্নে।

সিমনের বিখ্যাত বই '*দ্বিতীয় লিঙ্গ*' থেকে ছোট তবে খুব ছোট বই এটি নয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০৫।

সূচি নিম্নরূপ :

অবতরণিকা ৭
প্রস্তাবনা ১৫
প্রথমভাগ : বাইরের দৃষ্টিকোণ
১. বার্ধক্য ও জীববিদ্যা ২৩

২. জ্যোতির্বিদ্যার তথ্য ৪৫
৩. ইতিহাসপ্রোক্ত সমাজসমূহে বার্ধক্য ৯৭
৪. আজকের দিনের সমাজে বার্ধক্য ৩০
দ্বিতীয় ভাগ : বিশ্বে মানব অবস্থান
৫. বার্ধক্যের আবিষ্কার এবং শরীরগত যাপিত অভিজ্ঞতা ৩০১
৬. সময়, কর্মকান্ড, ইতিহাস ৩৮৩
৭. বার্ধক্য ও দৈনন্দিন জীবন ৪৭২
৮. বার্ধক্যের কয়েকটি উদাহরণ ৫৩১
উপসংহার ৫৬৫
পরিশিষ্ট
১. শতবর্ষ ৫৭৩
২. 'বয়স্কদের দেখাশোনা কে করে'? ৫৭৫
৩. সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে বৃদ্ধ শ্রমিকদের অবস্থা ৫৮৬
৪. বয়স্কদের যৌনতা সম্পর্কে পরিসংখ্যানে প্রদর্শিত তথ্যাবলী ৬০৩

অবতরণিকায় সিমন রাজকুমার সিদ্ধার্থের প্রথম অসুস্থ বয়স্ক ব্যক্তি দর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। এক বৃদ্ধকে দেখে তিনি তাঁর নিজের নিয়তির কথা অনুধাবন করলেন; কেননা মানবসত্তাকে বাঁচাতে জন্মগ্রহণ করে তিনি তাদের অবস্থার সামগ্রিকতাকে দায়িত্বরূপে গ্রহণ করেছিলেন। এতে তাঁর ভূমিকা ভিন্ন ; অসন্তোষের বিষয় মানুষ পরিহার করে, বিশেষ করে বার্ধক্য। আমেরিকাবাসীরা তাঁদের শব্দ ভান্ডার থেকে 'মৃত্যু' বাদ দিয়েছেন : তাঁরা বলেন 'প্রিয় বিদেহী'; বেশি বয়সের কথা তাঁরা বলতে চান না, আজকের ফ্রান্সেও এটা এক নিষিদ্ধ প্রসঙ্গ। সিমনের আত্মজীবনীর তৃতীয় খন্ড 'পরিস্থিতির চাপ' গ্রন্থে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা দেখে বহু লোক বাদানুবাদ করেছিলেন। ভদ্রভাবে বা রাগতস্বরে কেউ কেউ তাঁকে বলেছেন, 'বার্ধক্য বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। কিছু লোক আছে যাঁরা অন্যদের চেয়ে কম যুবক, এই তো ব্যাপারটা'!

নারী, শিশু ও বয়ঃসন্ধি নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে ফ্রান্সে, কিন্তু বিশেষজ্ঞদের সুনির্দিষ্ট বিষয় ব্যতিরেকে বার্ধক্য নিয়ে লেখার আগ্রহ কারুর নেই। এটা একটা দুঃখের বিষয়। সেজন্য সিমন লিখলেন এই বই, যা তাঁর ভাষায়, '*নিস্তব্ধতার ষড়যন্ত্র*' ছিন্ন করবে। সাত পৃষ্ঠার অবতরণিকায় তিনি জর্মন-মার্কিন দার্শনিক-মনস্তত্ত্ববিদ হার্বাট মারক্যুজ-এর 'ভোগ-লালসার' সমাজের মানুষের মনোভাবকে একটু নাড়া দিতে চান। কারণ বার্ধক্যের ব্যাপারে পাশ্চাত্য সমাজকে শুধু অভিযুক্ত নয় বরং অপরাধী বলে গণ্য করা যায়। প্রাচুর্য এবং প্রতুলতার বিপরীতে বৃদ্ধদের *পারিয়া* (তামিল থেকে ফরাশি ভাষায় গৃহীত শব্দ) বা অচ্যুতের পর্যায়ে গণ্য করা হয়। বিশ্বে বৃদ্ধের সংখ্যা ফ্রান্সে সর্বাধিক – ১২% শতাংশ ৬৫ বছরের বেশি। তাঁরা দুর্দশা, নৈঃসঙ্গ, অথর্বতা, এবং হতাশার শিকার। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও তাঁরা খুব সুখে নেই। তথাকথিত মানবতাবাদী নৈতিকতা অনুসরণের অন্ত রালে অনেক কিছু সেখানে ঘটে। ফরাশি সাহিত্যে চৈতন্যপ্রবাহ-রীতির উদ্‌গাতা মার্সেল প্রুস্ত-এর এবং নৃতত্ত্ববিদ ক্লোদ লেভি-স্ত্রাউসের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি আদিবাসী থেকে আধুনিক সমাজে বার্ধক্যকে কীভাবে অসুন্দরের সঙ্গে সমার্থবোধক বলে চিহ্নিত দেখতে পেরেছেন তা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। সিমনের কাছে যে সমাজ কাম্য তাতে 'সামগ্রিকতায় আমাদের মানব পরিস্থিতিতে' বিবেচনা করতে চান। শেষ বয়সের দুর্ভাগ্যের ব্যাপারে তিনি উদ্বেগ আকুল। বার্ধক্যে কর্মস্থল থেকে অবসর প্রাপ্তিকে যাঁরা মুক্তির সময় এবং আরাম-আয়েশের দিন মনে করেন তিনি তার বিরোধী। সমাজের খুব বড় একটি অংশ কিন্তু এতে দুঃখজনক দারিদ্রেই দিনযাপন করেন। বর্ণবাদ উঠিয়ে দেয়ার জন্য গান্ধী অচ্যুতদের অবস্থার উন্নতির কাজে লেগেছিলেন, সামন্ত পরিবার ধ্বংসের জন্য সাম্যবাদী চীন নারীমুক্তির ব্যবস্থা করেছিল। তাঁর মতে, 'মানুষ যাতে শেষ বয়স অবধি মানুষের পর্যায়ে থাকে সেজন্য দরকার বড় রকমের অদলবদল। সামান্য সীমাবদ্ধ কিছু পুনর্বিন্যাসে কাজ হবে না । গোড়া

থেকে দেখতে হবে বিষয়টিকে। সেজন্য খুব যত্ন করে তাকে চাপা দেওয়া হয়েছিল। এটাকে এখন ভেঙে ফেলা দরকার। আমার পাঠকের কাছে এজন্য আমি সাহায্য প্রার্থনা করছি।'

প্রস্তাবনায় বার্ধক্য বিষয়ে অধ্যয়নের সমস্যা ও সম্ভাবনার দিকটায় আলোকপাত করেন সিমন। তাঁর মতে, বার্ধক্যকে সমগ্রতার পরিপ্রেক্ষিতেই কেবল বোঝা যাবে; এটি জৈবিক ঘটনা নয়। বরং একটি সাংস্কৃতিক বাস্ত বতা।

যুগান্তকারী গ্রন্থ *দ্বিতীয় লিঙ্গের* পাঠকদের যে অভিজ্ঞতা, *বার্ধক্যও* প্রায় একই ধরনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে। কেননা সিমন দ্য বোভোয়ার ইতিহাস, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান ও সাহিত্য থেকে পর্যাপ্ত উদাহরণ খুঁজে নিয়ে তাঁর এই বিশাল গ্রন্থ সমাপ্ত করেছেন এবং অস্তিত্ববাদী সাহিত্যিকরূপে স্বআরোপিত কর্তব্য সমাধানে অগ্রসর হয়েছেন।

গ্রন্থের উপসংহারে তিনি মন্তব্য করেন, 'বার্ধক্য মানব অস্তিত্বের প্রয়োজনীয় সমাপ্তি নয়। শরীর – যাকে সার্ত্র বলেছেন অনিশ্চিত সম্ভাবনার ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় কিছু, বার্ধক্য তারও প্রতিনিধিত্ব করেনা । ... এটা এক প্রায়োগিক এবং সর্বজনস্বীকৃত সত্য যে কিছু বছরের ব্যবধানে মানব জীবসত্তা এক অভ্যন্তরীণ জটিলতায় পড়ে যাবে। প্রক্রিয়াটি অপরিহার্য। ... বস্তুত, মৃত্যুর চেয়ে বার্ধক্যকেই জীবনের বিপরীতে দাঁড় করাতে হয়। বার্ধক্য জীবনের ব্যঙ্গাত্মক রূপ (প্যারোডি)। মৃত্যু জীবনকে নিয়তিতে রূপান্তরিত করে।'

সিমনের মতে, এটা আমাদের সমাজের অপরাধ যে, এর বার্ধক্য সম্পর্কিত নীতি 'কলঙ্ক' বিশেষ। তার চেয়েও লজ্জাকর কাজ হলো যা মানবসমস্যাকে তার যৌবনে এবং তাদের পূর্ণ বয়ঃসন্ধিকালে আরোপ করে থাকে। তাই যেসব প্রতিষেধক বৃদ্ধদের দুঃখ দুর্দশা অপনোদনের জন্য দেওয়া হয় তা হাস্যকরভাবে নিম্নমানের। মানুষকে সবসময় মানুষের মত

ব্যবহার করতে হবে। উনিশ শতকের শাসকশ্রেণী শোষিতদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার কায়েম রেখেছিল, শ্রমিকদের সংগ্রামের ফলে তারা মানুষের পর্যায়ে পুর্নবাসিত হতে সফল হয়েছে। কিন্তু শুধু কর্মক্ষম থাকার কালে। বৃদ্ধ শ্রমিকের প্রতি সমাজ যেন কিছু অচেনা বিদেশীর মতো মুখ ঘুরিয়ে রাখে।

একটি আদর্শ সমাজের স্বপ্ন দেখা যেতে পারে যেখানে আর বার্ধক্য থাকবে না। যেমন, কিছু সুবিধাজনক অবস্থায় দেখা যায় যে, ব্যক্তি বিশেষ বয়সের ভারে গোপনে ন্যুব্জ হয়ে পড়বে কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে খর্বাকৃতি ধারণ করবে না; একদিন কোন অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়ে পড়বে যার প্রতিরোধ করতে পারবে না, অধঃপাতে না গিয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করবেন। ... যখন বৃদ্ধদের অবস্থা কেউ অবহিত হবেন, অবশ্যই তিনি চাইবেন বৃদ্ধদের জন্য একটি উদারনীতি, উন্নতমানের অবসর ভাতা, স্বাস্থ্যকর বাসস্থান, বিশ্রামের সুব্যবস্থা। সমস্ত ব্যবস্থাপনাই প্রশ্নবিদ্ধ, এর থেকে উত্তরণের দাবী হবে কাঠামোগতভাবে বৈপ্লবিক : জীবনধারার পরিবর্তন।

বিদায় সার্ত্র : ১৯৭০-১৯৮০

"তাহলে এই কি শেষ বিদায়, না তার আনুষ্ঠানিকতা?" - এক গ্রীষ্মের গোড়ায় এক মাসের জন্য একে অপরকে ছেড়ে যাবার সময় সার্ত্র আমাকে বললেন কথাটা। আমি একটু আগাম ভাবনায় পড়লাম কথাটার কী তাৎপর্য হতে পারে তা ভেবে। আনুষ্ঠানিকতার মেয়াদ দাঁড়াল দশ বছর : এই দশ বছরই আমি এই বইতে তুলে ধরেছি।" সিমন দ্য বোভোয়ার তাঁর *লা সেরেমনি দেজাদিয়্য সুইভি দ্যাত্রতিয়্যাঁ আভেক জঁ -পল সার্ত্র উ -সেপ্তঁব্র ১৯৭৪* গ্রন্থের চতুর্থ প্রচ্ছদে এভাবে প্রকাশ করেছেন বইটির পূর্ণ পরিচিতি।

প্যারিসের প্রখ্যাত প্রকাশক গালিমার ১৯৮১ সনে এটি বের করেন। বইটিতে রয়েছে এক পৃষ্ঠা সিমন - পরিচিতি, এক পৃষ্ঠা উৎসর্গপত্র, এক পৃষ্ঠা ভূমিকা, দশ বছরের সালতামামি (পৃঃ ১৩-১৭৬) এবং সার্ত্র-সাক্ষাৎকার আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ (ভূমিকা ১৮০, কথোপকথন : ১৮১-৬২৫ পৃষ্ঠা)। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে - 'তাঁদের যাঁরা সার্ত্রকে ভালোবেসেছিলেন, ভালোবাসেন এবং ভালোবাসবেন'।

ভূমিকায় সিমন লিখেছেন,

> 'এই যে আমার প্রথম বই, নিঃসন্দেহে প্রথম, যা মুদ্রিত হবার আগে আপনি পড়বেন না। সর্বতোভাবে বইটি আপনার সম্পর্কে অথচ তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক থাকবেনা। যখন আমাদের বয়স কম ছিল, উত্তেজক আলোচনার শেষে বিজয়ী দাপটের সঙ্গে অন্যকে বলতো : "আপনি আপনার ছোট বাক্সে গিয়ে পড়ে থাকুন

গে !" এখন আপনি আপনার ছোট বাক্সে পড়ে আছেন, ও থেকে আপনি আর বেরুবেন না । আমিও আপনার কাছ ঘেঁষবো না, আপনার পাশে আমাকে কবর দিলেও না, আপনার ভস্ম আর আমার দেহাবশেষের মধ্যেও হবে না কোনো আনাগোনা।

এই যে আমি আপনাকে 'আপনি' ব্যবহার করছি তা' একটি প্রপঞ্চ, একটি আলংকারিক ফানুষ। কেউ শুনছে না; আমি কাউকে বলছিও না, আসলে আমি সম্বোধন করছি সার্ত্রের বন্ধুদের : যাঁরা তাঁর শেষ বছরগুলো ভালোভাবে জানতে চান। আমি সেভাবে তার বর্ণনা করেছি, যেভাবে আমি সেগুলো যাপন করেছি। আমি কোথাও কোথাও একটু নিজের কথা বলেছি কেননা সাক্ষী তার সাক্ষ্যের অংশবিশেষও তো বটে, কিন্তু আমি তা যতো সম্ভব কম বলেছি। প্রথমত, যেহেতু সেটা আমার বিষয় নয়, তারপর বন্ধুদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আমি টুকে রেখেছি কীভাবে আমি সবকিছু গ্রহণ করেছি : "এটা বলার নয়, এটা লেখার নয়, এটা ভাষারও নয়, এটা শুধু বেঁচে থাকার, এটা শুধু এটাই।"

এই কাহিনী মূলত এই দশ বছরে রাখা আমার রোজনামচার ওপর ভিত্তি করে। এবং অবশ্যই আমার সংগৃহীত বহু সংখ্যক সাক্ষ্যের ওপর। ধন্যবাদ সবাইকে যাঁরা তাঁদের লেখা বা জীবন্ত কণ্ঠস্বরে আমাকে সার্ত্রের উপসংহার পুনর্গঠনে সহায়তা দিয়েছেন।'

১৯৭০

সারাটি যাপিত জীবনে সার্ত্র তাঁর "আদর্শগত স্বার্থে"এবং যাতে তার থেকে বিচ্যুত না-হন তাই কখনো "নিজের বিরুদ্ধে চিন্তা করা", "নিজের মাথায় হাড্ডি ভাঙা" র মত শক্ত কাজ প্রায় পছন্দ করে থাকতেন। ১৯৬৮-র ঘটনাবলীর পর সেজন্য তিনি বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা কী হবে তা নিয়ে

গভীরভাবে ভেবে দেখছিলেন। কখনো কখনো তা বিশ্লেষণও করেছেন। এতাবৎ, যেমন জাপানের বক্তৃতামালায়, বুদ্ধিজীবীদের তিনি "বাস্তব জ্ঞানের প্রযুক্তিবিদ" মনে করতেন। এখন তাঁর মনে হল, সত্যিকার বৈশ্বিকতা অর্জনের জন্য জনগনের মধ্যে মিশে যেতে হবে। '৬৮-র হেমন্তে 'অন্তর্যুদ্ধ' (*অ্যাঁতেরল্যুৎ*) সম্পাদনা কালে তিনি ক্রমশ এই মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়ছিলেন। কাগজটি কখনো ছাপা, কখনো সাইক্লোস্টাইল হয়ে বেরুত, প্রধানত সংগ্রাম পরিষদগুলোর জন্য। '৬৯ থেকে জেসমার তাঁকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করছিলেন যাতে জনতা জনতার সঙ্গে ভাব-বিনিময়ের মাধ্যমে গণসংগ্রাম পরিচালিত করতে সক্ষম হয়। এ সময়ে জেসমার 'গোশ প্রলেতারিয়েন' (সর্বহারা বাম) নামক নতুন দলে যোগ দিলেন আর সার্ত্রকে মাওবাদীরা তাঁদের পক্ষে টেনে *লা কোজ দ্য প্যপল্* (জনগনের স্বার্থ) শীর্ষক পত্রিকা বার করলেন ; এর কোন মালিক নেই। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শ্রমিকদের কাগজ, প্রায় ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের বিপক্ষে, কখনো সার্ত্রেরও বিরুদ্ধে। ব্রাসেলসে এক বক্তৃতায় সার্ত্র বললেন : "নৈরাশ্যবাদীর মতো আমি আমার নামের মর্যাদা দিয়েছিলাম তৌলদন্ডে।" ক্রমে মাওবাদীরা তাঁদের নীতি পরিবর্তন করেছিলেন। এ সময়ের অনেক জটিল সমস্যা নিয়ে সিমন তাঁর তু *কোঁৎ ফে* ('সব হিসাব-নিকাশের পর') গ্রন্থে বিস্তৃত লিখেছেন। ১লা মে ১৯৭০ *লা কোজ দ্যু প্যপল* প্রকাশ পেলে পুলিশ তার সব কপি জব্দ করতে গিয়েছিল। কিন্তু মুদ্রাকর বুদ্ধি খাটিয়ে বেশিরভাগ সংখ্যা বাইরে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। সার্ত্র, সিমন ও অন্য বন্ধুরা মিলে প্যারিসের কেন্দ্রস্থলে পত্রিকাটি নিজেরা বিক্রি করতে শুরু করলেন। তাছাড়া, সিমন ও মিশেল লেয়রিস মিলে প্রতিষ্ঠা করলেন পত্রিকার বন্ধু-সমিতি। জুনে সার্ত্র 'সকুর রুজ' (লাল ত্রাণ-সংস্থা) শীর্ষক নিপীড়নের প্রতিবাদে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। এ সময় বহু ব্যক্তি সরকারী নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল। প্রতিষ্ঠানটি খুব শীঘ্রই জনপ্রিয়তা অর্জন করলো। কয়েক হাজার সদস্যসহ ফ্রান্সের সর্বত্র বহু শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে গেল। অভিবাসীদের সাহায্যদানও এই প্রতিষ্ঠানের একটা লক্ষ্যে

পরিণত হল। বিভিন্ন মতবাদের কর্মীর সমাহার ঘটলেও মাওবাদীরাই এতে নেতৃত্ব দিতে থাকল।

এভাবে ঘোরতর সংগ্রামী কার্যকলাপে লিপ্ত হলেন সার্ত্র। তবে তাঁর সাহিত্যকর্মেও তিনি ছিলেন পূর্ণমাত্রায় সক্রিয়। তিনি তখন তাঁর সুবিশাল ফ্লোবের গ্রন্থমালার তৃতীয় খন্ড শেষ করে এনেছেন। ১৯৫৪ সালে রজে গারোদি তাঁকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন : "চলুন, আমরা কোনো এক ব্যক্তিত্বকে নিয়ে বিশ্লেষণ করি - আমি করবো মার্কসীয় মেথড মোতাবেক আর আপনি করবেন অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিকোন থেকে।" সার্ত্র ঠিক করেছিলেন ফ্লোবেরকে নিয়ে কাজ করবেন কেননা তাঁর সম্পর্কে তিনি কিছু উগ্র মন্তব্য করেছিলেন তাঁর 'সাহিত্য কী' গ্রন্থে। কিন্তু পরে ফ্লোবের-এর 'চিঠিপত্র' পাঠ করে সার্ত্রের ধারণা বদলে যায়। ফ্লোবেরের কল্পনাশক্তির প্রাধান্য তাঁকে আকৃষ্ট করে। সার্ত্র তখন কয়েক ডজন খাতা লিখে ভর্তি করতে থাকেন এবং হাজার পৃষ্ঠার এক বই লিখে ফেলেন। কিন্তু ১৯৫৫ সালে সেটি ফেলে রাখেন। '৬৮-'৭০ সালে বইটি তিনি সম্পূর্ণ নতুন করে আবার লিখলেন। *লিদিও দ্য লা ফামিই* (পরিবারের বুদ্ধুটি) শিরোনাম দিয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহকারে তিনি এক বিশাল গ্রন্থ লিখে ফেলেন যাতে একই সঙ্গে একটি কর্মপদ্ধতি ও একজন মানুষের স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে পড়েছিল।

মাওবাদী বন্ধুরা তাঁর সমালোচনামুখর হলেন ; তাঁদের ইচ্ছা, সার্ত্র সংগ্রামী রচনা লিখুন, একটা জনপ্রিয় উপন্যাস লিখুন। সার্ত্র অনুভব করলেন তাঁদের অভিপ্রায় ; কিন্তু একমত হলেন না তাঁদের সঙ্গে। সেপ্টেম্বর '৭০ : সার্ত্র-সিমন রোম থেকে আনন্দমুখর ছুটি কাটিয়ে এলেন। তখন সিমনের বাড়ির কাছে এগার তলায় একটি ছোট্ট এপার্টমেন্টে থাকতেন সার্ত্র। বাড়িটি মোপারনাস কবরস্থানের মুখোমুখি, বুলভার রাসপাই-তে। রুটিনমাফিক জীবনযাত্রা চলছিল। তাঁদের পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাৎ: ওঅঁদা, মিশেল ও তাঁর পালিতা কন্যা আরলেৎ এলকাইম - যাঁর বাড়িতে তিনি সপ্তাহে দু-রাত কাটান। বাকি সন্ধ্যা

সিমনের ঘরে। সেখানে তাঁর প্রধান আকর্ষণ সঙ্গীত শ্রবণ : মোৎসার্ট, স্ত কহাউসেন, এগজেনাকিস, পেরিও, ভের্দি প্রমুখ। সার্ত্র রাত্রে ডুপ্লেক্সের উপরের তলার বিছানায় শুতেন, সিমন নীচের ঘরে। সকালে সার্ত্র নেমে এসে সিমনের সঙ্গে চা পান করতেন ; কখনো তাঁর বান্ধবী লিলিয়ান এসে নীচে একটা বিস্ত্রো (ক্যাফে/পাব)-তে কফি খাওয়াতে নিয়ে যেতেন। কখনো কখনো সন্ধ্যায় বোস্ত, লঁজমান বসতেন আলোচনায়। এরমধ্যে সিলভি এসে শনিবার সন্ধ্যায় ও রোববারের মধ্যাহ্নভোজনের জন্য লা কুপল রেস্তোরঁয় যোগ দিতেন। বিকেলে সিমন সার্ত্রের বাড়িতে বসে কাজ করতেন। তখন তাঁর 'বার্ধক্য' গ্রন্থটি বেরুচ্ছে এবং তিনি তাঁর স্মৃতিকথার শেষ খন্ডের কথা ভাবছেন। সার্ত্র ফ্লোবের সংশোধনে ব্যস্ত থাকতেন। 'এটা ছিল অত্যুজ্জ্বল হেমন্ত : সুনীল ও সোনালী।'

সেপ্টেম্বরে সার্ত্র 'সকুর রুজ'-এর খুব বড়সড় একটি জনসভায় অংশগ্রহণ করলেন। জর্দানে বাদশাহ হোসেন কর্তৃক ফিলিস্তিনিদের হত্যার প্রতিবাদে আয়োজিত ছিল সভাটি। 'ব্ল্যাক প্যানথারের' সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জঁ জনেও সেখানে ছিলেন। জনে সাপ্তাহিক *লা লুভেল অবসেরভাত্যরে* এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তখন জর্দানে গিয়ে একটি ফিলিস্তিনি ক্যাম্পে অবস্থানের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন তিনি।

দীর্ঘদিন সার্ত্রের স্বাস্থ্য নিয়ে দুর্ভাবনায় পড়তে হয়নি সিমনকে। দিনে দু প্যাকেট বয়য়ার (চুরুট/সিগারেট) খেলেও তেমন কোনো সমস্যা দেখা দেয়নি। হঠাৎ করে সেপ্টেম্বর - শেষে বিপদ এল ঘনিয়ে ।

এক শনিবার সন্ধ্যায় সিলভি সহ দমিনিক রেস্তোরঁয় নৈশ ভোজন সেরে ফেরার পথে সার্ত্র প্রায় ঘুমিয়ে পড়লেন। মাত্রাতিরিক্ত ভদকা পান করেছিলেন তিনি । মুখ থেকে সিগারেট গেল পড়ে । সিমন ও সিলভি ধরাধরি করে তাঁকে তাঁর কক্ষে শুইয়ে দিলেন। সকাল বেলা অবশ্য তিনি বেশ সুস্থ হয়ে গেলেন। একা একা নিজের বাড়ি ফিরে গেলেন। দুটোর

সময় সিলভি ও সিমন তাঁকে নিয়ে লা কুপল - এ খেতে গেলে তাঁকে আবার ঝুঁকে ঝুঁকে চলতে দেখা গেল। খুব অল্প পান করলেন । লা কুপল থেকে ফেরার পথে তিনি অশক্ত পদক্ষেপে হাঁটছিলেন ও বিড়বিড় করছিলেন। একটা ট্যাক্সি নিয়ে ওঁদার বাসায় যাওয়া হলো। গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে তিনি আবার প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন।

এরকম আগেও তাঁর দু-একবার ঘুরে পড়ে যাবার মতো অবস্থা দেখা দিয়েছিল। '৬৮ সালে একবার রোমে গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে তিনি পড়ে যাচ্ছিলেন । সিলভি ও সিমন তাঁকে ধরে তুলেছিলেন । অথচ সে সময় তিনি কিছুই পান করেননি । ব্যাপারটি সিমনকে ভাবিয়ে তুললো । তাঁর মনে পড়ে গেল, অনেক আগে, ১৯৫৪ সালে সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণ শেষে রক্তচাপের সমস্যায় তাঁকে একবার হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছিল। '৫৮ সালেও একবার সমস্যা দেখা গিয়েছিল (দ্রষ্টব্য : তৃতীয় খন্ড আত্মজীবনী, 'পরিস্থিতির চাপ')। পরদিন সার্ত্র একটু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে তাঁর চিকিৎসক ডা: যাইদমান ও বিশেষজ্ঞ প্রফেসর লব্যোর সঙ্গে পরামর্শ করা হলো । নানা নিরীক্ষা ও একটি এনসেপালোগ্রাম করা হলো। কিন্তু খারাপ কিছু পাওয়া গেল না ।

ক্লান্ত সার্ত্রের ঠোঁটে একটা ফোঁড়া। সর্দির আলামত। কিন্তু খুবই হাসি খুশি । ৮ই অক্টোবর তিনি গালিমার -এর কাছে তাঁর বিশাল ফ্লোবের পান্ডুলিপি হস্তান্তর করলেন ।

মাওবাদীরা তাঁর জন্য কয়েকটি শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের বস্তি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু চিকিৎসকরা মানা করলেন। ইত:মধ্যে তাঁর চোখ, কান, মাথা, মগজ ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়েছিল - কমপক্ষে এগার দফা ভিজিট । মগজের বাঁ পাশে (ভাষার এলাকায়) রক্ত চলাচলের সমস্যা আছে। ধূমপান কমিয়ে দেওয়া, এনার্জি-র জন্য কয়েকটি ইনজেকশান, দুমাস পর মাথার এনসেপালোগ্রাম - আপাতত এই হল তাঁর

চিকিৎসা । তবে তিনি যেন কিছুতেই অতিরিক্ত পরিশ্রম না করেন । বস্তুত, তাঁর এখন বেশি খাটবার প্রয়োজন নেই। ফ্লোবের শেষ, বাকি শুধু কিছু পান্ডুলিপি পরীক্ষা, ডিটেকটিভ উপন্যাস পাঠ আর অস্পষ্টভাবে একটা নাটকের স্বপ্ন । এর মধ্যে রবেয়রলের 'সহঅবস্থান' শীর্ষক প্রদর্শনীর জন্য একটা ভূমিকা লিখলেন। শিল্পী এবং তাঁর ছোট্ট, আর্মেনিয়ান স্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের কিছু ভালো সময় কেটেছিল রোমে। দেখা হলো তাঁদের বন্ধু সাংবাদিক ফ্রঁকি-র সঙ্গে যিনি '৬০ সালে সার্ত্র -সিমনকে কিউবায় আমন্ত্রন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরে প্রো-সোভিয়েত রাজনীতির কারণে কাস্ত্রোর সঙ্গে ফ্রঁকির বিরোধ ঘটে এবং তিনি নির্বাসনের পথ বেছে নেন।

স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলেও সার্ত্র রাজনৈতিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে পড়েন আরেকটু বেশি মাত্রায়। ২৭শে অক্টোবর একটা বড় বিক্ষোভ - মিছিল হলো। কিন্তু রক্তাক্ত কিছু হলো না। সার্ত্র কোর্টে সাক্ষ্য দিতে না গিয়ে রনো মোটর গাড়ির কারখানার সামনে শ্রমিকদের সম্বোধন করেন। কারখানার ভেতরে তাঁকে প্রবেশ করতে দেওয়া হলো না। কম্যুনিষ্ট পার্টি সকালেই তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারপত্র বিলি করেছিল। মাইক হাতে কাঠের বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলেন সার্ত্র : "জেস্‌মারের কর্মকান্ড ভালো কি মন্দ তা বলার অধিকার কেবল আপনাদেরই আছে। আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেব কেননা আমি একজন বুদ্ধিজীবী । আমি মনে করি, উনিশ শতকে জনগনের সাথে বুদ্ধিজীবীর যে সম্পর্ক ছিল - সবসময় না হলেও তা খুবই সুফল বহন করে এনেছিল। তাই আজ ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। পঞ্চাশ বছর হলো জনগণ ও বুদ্ধিজীবী আলাদা হয়ে আছে, এখন আমাদের আবার একত্র হওয়া আবশ্যক।" সার্ত্র বিরোধীরা, বিশেষ করে কম্যুনিষ্টরা তাঁর এই ভূমিকা হাস্যকর মনে করল। জেস্‌মারের আঠারো মাস জেল হল। সার্ত্র আরেকটি নতুন পত্রিকা, *জাক্যুজ* (আমি অভিযোগ করি)-এর সঙ্গে যুক্ত হলেন। এতে চিত্র-পরিচালক গদারও ছিলেন। লিলিয়ান ছিলেন প্রকাশনার দায়িত্বে। কয়েকটি মাত্র সংখ্যা বেরুলো। সরকার যেহেতু

সার্ত্রকে কিছুতেই গ্রেফতার করবেন না, তাই সম্ভবত লিলিয়ানকে আসামী করা হলো । সার্ত্র সাক্ষ্য দিলেন তাঁর পক্ষে। সিমন চিন্তান্বিত। সার্ত্র কখনো কখনো নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন । মদ্যপানও বেড়ে গেছে আবার । চিকিৎসক বললেন, ঔষধের কারণেও হতে পারে। ডোজ কমিয়ে দেওয়া হলো। ২২ শে নভেম্বর এন্‌সেপালোগ্রাম করা হলে ভালো ফলই পাওয়া গেল। এবার সমস্যা দেখা গেল দাঁতের। তারও সুচিকিৎসা হলো। এসময়ে কোঁতা ও রিবালকা সম্পাদিত *লেজেক্রি দ্য জঁ-পল সার্ত্র* প্রকাশিত হল। সার্ত্র সন্তুষ্ট। চলল আরো কিছু রাজনৈতিক কর্মকান্ড। দু চারবার প্যারিসের বাইরেও গেলেন তিনি। একবার এক কয়লা শ্রমিকের বাড়িতেও রাত কাটালেন । একটা অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে দুঘন্টা হাঁপানিতে ভুগলেন। *তু (সব) এবং লা পারল ও প্যপল্* (জনগনই কথা বলবে) নামে দুটো বামপন্থী পত্রিকার দায়িত্বও তাঁর ঘাড়ে চাপলো ।

১৯৭১

জানুয়ারী মাসের গোড়ায় সোভিয়েত রাশিয়া ও স্পেনে দুটি বিচারাধীন বিষয় নিয়ে সারা পৃথিবীতে তোলপাড় হল : একটি বিমান ছিনতাই, আর অন্যটি হলো বয়স্কদের জাতীয়তা প্রসঙ্গ ও স্বৈরশাসক ফ্রাঙ্কোর দমন নীতি। প্রথমটির জন্য আয়োজিত একটি বড় জনসভায় সার্ত্র অংশগ্রহণ করলেন, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে একটি বইয়ের ভূমিকা লিখলেন তিনি। ভূমিকা লিখতে গিয়ে সার্ত্র তাঁর প্রিয় একটি আইডিয়াকে বিকাশমান করবার সুযোগ গ্রহণ করলেন। সেটি হলো সর্বজনীন ভাবমূলক আর তার বিপক্ষে রয়েছে একক এবং সুনির্দিষ্ট বিশ্বজনীনতা। প্রথমটির ক্ষেত্রে রয়েছে ক্ষমতাসীন সরকারসমূহ আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে রক্তমাংসের মানুষ। এতে উপনিবেশিক বিদ্রোহের উদ্ভব ঘটে - বাইরে অথবা অভ্যন্তরে, এবং এটাই স্থায়ী হয়ে পড়ে কেননা এতে মানুষকে পাওয়া যাবে তাদের অবস্থানে, সংস্কৃতিতে, তাদের ভাষায়। কোন শূন্য ধারনার ওপর ভিত্তি করে নয়। কেন্দ্রীভূত ও

আদর্শগত সমাজতন্ত্রের বিপক্ষে সার্ত্রের কাম্য অন্য একটি সমাজতন্ত্র যা বিকেন্দ্রীভূত এবং বাস্তবসম্মত। তাঁর মতে প্রয়োজন ভাষা, মাটি, এমনকি পরিশীলিত সামাজিক রীতিনীতি যা সমাজতান্ত্রিক মানুষ গড়ে তুলবে । কেবল এতে করেই মানুষ ক্রমশ তার উৎপাদনের উৎপাদন না হয়ে অবশেষে মানব - সন্তানে পরিণত হবে । এসব চিন্তার ভিত্তিতে দু-বছর পর সার্ত্র দাবী দাওয়ার বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনার শিকার জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর তাঁর '*আধুনিক সময়* ' *পত্রিকার (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর* ৭৩) একটি বিশেষ সংখ্যা করিয়েছিলেন।

এ সময়ে রাজবন্দীরা অনশন ধর্মঘট করেন। সার্ত্র প্রায় তাঁদের দেখতে যান। ১৩ ই ফেব্রুয়ারী সাক্রে-ক্যর গির্জা দখলের মতো একটা নির্বোধ পরিকল্পনা মাওবাদীরা করলেন যাতে তাঁরা সার্ত্রকে বুঝিয়ে রাজী করিয়ে নিয়েছিলেন। ভাগ্যক্রমে তিনি রায়ট পুলিশের ভয়ংকর মারপিট থেকে রেহাই পেয়ে গিয়েছিলেন সেবার। ১৫ তারিখ তিনি সকুর রুজ-এর কার্যকরী সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন । কিন্তু পরেও এর বহু কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

কয়েকদিন পর এল গিইও সংক্রান্ত জটিলতা। স্কুল ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় আরেক বিদ্রোহের সূচনা করে ফেলেছিল। সার্ত্র কাছ থেকে ঘটনা অনুসরণ করছিলেন। তাছাড়া তাঁর সময় কাটছিল ফ্লোবের - এর প্রুফ সংশোধন ও 'আধুনিক সময়ের' বৈঠকে যা অনুষ্ঠিত হতো সিমনের বাড়ীতে ।

এপ্রিলের গোড়ার দিকে তাঁরা স্যাঁ-পল-দ্য-ভঁস-এ বেড়াতে গেলেন। সার্ত্র গেলেন আর্লেৎ-এর সঙ্গে ট্রেনে, সিমন চললেন সিলভির গাড়ীতে । বাগান ও বাসাবাড়ি নিয়ে চমৎকার পরিবেশ। সার্ত্র-সিমন প্রায় সন্ধ্যা একত্রে কাটালেন। স্কচ সেবন ও বাক্যসুধা পান । রাত্রে শুধু শুকনো মাংস ও চকোলেট । দুপুরে সিমন তাঁকে নিয়ে যেতেন কোনো রেস্তোরঁয় । প্রায় চার জনেই মিলিত হতেন সেখানে। কোনো কোনো বিকেলে তাঁরা রচনা

পাঠে কিংবা প্রমনাদে কাটাতেন। এক অপরাহ্নে তাঁরা ফোঁদাসিওঁ ম্যাগৎ (যাদুঘর) দেখতে গেলেন। পূর্ব পরিচিত যাদুঘর। তবে সেবার কবি শার-এর ওপর একটি প্রদর্শনী চলছিল । ক্লে, জিয়াকোমেত্তি, মিরোর অসাধারণ শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হচ্ছিল সেখানে।

শেষদিন সার্ত্র *আইওলি* খেতে চাইলেন। সার্ত্র যথারীতি আর্লেতের সঙ্গে ট্রেনে, সিমন ও সিলভি গাড়িতে ফিরে এলেন প্যারিসে। এই ভ্রমণ সার্ত্রকে খুবই উৎফুল্ল করে তুলেছিল । ফিরেই তিনি গালিমার-এর কাছ থেকে পেলেন বিরাট এক বাক্সে দু হাজার পৃষ্ঠার প্রুফের - বইয়ের কয়েকটা কপি । সার্ত্র সিমনকে বলেছিলেন, তাঁর প্রথম বই *লা নোজে* (বিবমিষা) প্রকাশের সময় তিনি যে-আনন্দ লাভ করেছিলেন এটা তার চেয়ে কম নয় ! সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণ অভিনন্দনসূচক লেখাও প্রকাশিত হতে থাকল চারদিকে।

মে-মাসে কিছু ঘটনা ঘটল যাতে কিউবা এবং তার নায়ক কাস্ত্রোর সঙ্গে সার্ত্রের সম্পর্কের অবনতি অপরিহার্য হল। দেশ-বিদেশের কিছু বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ চলল। ১২ই মে সার্ত্র ইভরির মেয়র-অফিসের সামনে একটি বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন । ঘটনা হল : বেহার বেহালা বলে এক দুর্বল অভিবাসী দইয়ের গাড়ি থেকে এক কৌটা দই চুরি করেছিল । পুলিশ তাকে গুলি করে বেশ জখম করে। 'সকুর রুজ' তাই এই বিক্ষোভের আয়োজন করে ।

সার্ত্র এ সময়ে সিমনের বাড়িতে বেশি সময় থাকেন কারণ তাঁর বাড়ির লিফট নষ্ট। ১৮ তারিখ তাঁকে বেশ অবসন্ন দেখাল। ঠোঁট ঝুলে পড়ে। খুব সম্ভবত পূর্বরাত্রে তাঁর মাইল্ড এটাক হয়েছিল । পরে ডাক্তারের কাছ থেকে জানা গেল তাঁর শারীরিক অবস্থা গত অক্টোবরের চেয়ে খারাপ । লিফট সেরে যাওয়ায় সার্ত্র তাঁর বাড়িতে উঠে গেলেন। পরে সিলভি দুজনকে তাঁর গাড়িতে চড়িয়ে সিমনের বাসায় নিয়ে এলেন । সে রাত্রে সার্ত্র শুধু ফলের রস পান করলেন । তাঁর মুখ থেকে সিগারেট বারবার পড়ে যাচ্ছিল। সিমন

সার্ত্রের প্রিয় সংগীত ভের্দির *রকিয়েম* চড়িয়ে দিলেন রেকর্ড প্লেয়ারে। সকালে সার্ত্রের ডান হাত প্রায় অবশ দেখা গেল । সিমন ডাক্তার লবো-কে ফোন করলেন । তিনি ব্যস্ত তাই ডা: মাউদ্যোকে পাঠালেন । সার্ত্রের বাড়িতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলল। নতুন প্রেসক্রিপশান দিয়ে পরবর্তী আটচল্লিশ ঘন্টা খুব সাবধানে থাকতে বলে গেলেন ডাক্তার, আর তিনি যেন কখনো একলা না থাকেন ।

২৬ শে মে'র দিকে সার্ত্র বেশ সুস্থ হয়ে গেলেন । হাসি-খুশি, হাঁটা চলা, কথাবার্তায় জড়তাহীন। দোতলায় শুতে গিয়ে হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন : "আমি আমার কাস্তরকে একটুও ব্যথা দিতে চাইনা ... খুব হালকা (আঘাতও না)।" সিমন অভিভূত হয়ে গেলেন । একটু আগে লা কুপলে খেতে গিয়ে অদূরে উপবিষ্টা একটি অল্পবয়েসী মেয়েকে দেখিয়ে সার্ত্র বলছিলেন, তাকে নাকি ঐ বয়সের সিমনের মতোই মনে হচ্ছিল ।

তাঁর হাত প্রায় অবশ তবু *সিত্যুয়াসিওঁ ৮ এবং ৯* এর প্রুফ সংশোধন করছিলেন। জুনে তিনি মোরিস ক্লাভেল-এর সঙ্গে *লিবেরাসিয়োঁ* (স্বাধীনতা) সংবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করলেন । মাসের শেষদিকে হঠাৎ তাঁর জিহবায় দেখা দিল কিছু অসুবিধা। কথা বলতে বা খেতে কষ্ট পেতে লাগলেন । এ সময়ে আসন্ন মৃত্যু নিয়ে কিছু কথা বললেন তিনি । ক'দিন পর সিলভির বাড়িতে তাঁর ৬৬ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হল । তখন খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল তাঁকে ।

এদিকে সিমন খুব বিষন্ন হয়ে পড়ছিলেন। কিছু দিনের জন্য তিনি সার্ত্রকে ছেড়ে যাবেন । সিলভির সঙ্গে ভ্রমণে বেরুবেন। ইতোমধ্যে সার্ত্রও তিন সপ্তাহ আর্লেৎ -এর সঙ্গে, দুসপ্তাহ ওঅঁদার সঙ্গে থাকবেন। যাবার দিন দুপুরে দুজন লা কুপলে খেলেন । চারটেয় সিলভি আসবে । তিন মিনিট আগে সিমন উঠে পড়লে সার্ত্র রহস্যময় হাসি হেসে তাঁকে বললেন : "তাহলে, এই কি শেষ বিদায় না তার আনুষ্ঠানিকতা?" সিমন কিছু না বলে শুধু তাঁর কাঁধে হাত রাখলেন । তাঁর কাছে শেষ বিদায় (*আদিয়্য*) কথাটা বিশেষ তাৎপর্যময় মনে হল।

সিলভির সঙ্গে ইতালী গেলেন সিমন । ইতালীর প্রতি অনুরাগ, ভ্রমণের আনন্দ মাটি হয়ে গেল। ঘুমানোর আগে বহুক্ষণ কাঁদলেন। সুইজারল্যান্ডে তখন ভালো সময় কাটাচ্ছিলেন সার্ত্র । খবর আসতো টেলিগ্রাম মারফত ।

১৯৭২

জেলখানায় বন্দীদের দুরবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন সার্ত্র। ১৮ই জানুয়ারি দ্যলাজ, ফুকো, ক্লোদ মোরিয়াক প্রমুখকে নিয়ে বহু সাংবাদিকের উপস্থিতিতে চলে এক সম্মেলন। এক পর্যায়ে শুরু হয় পুলিশী নির্যাতন। সার্ত্র ও ফুকু অনেককে আড়াল করে বাঁচালেন। পরে *লিবেরাসিও* সংবাদ সংস্থায় গিয়ে সার্ত্র ব্যঙ্গ করে বললেন: "লে সে. এর. এস (ইংরেজিতে সি . আর. এস= রায়ট পুলিশ) যে খুব একটা নৃশংস ছিল তা নয়, বিশেষভাবে যে নরোম-শরোম তাও নয়, ওরা ওদের মতোই ছিল।"

এ সময়ে কোঁতা ও আস্‌ক্রুক তাঁর ওপর একটা ছবি তৈরি করছিল, তাঁর প্রতিষ্ঠিত পত্রিকার অনেকেই এতে ছিল। সার্ত্র তাঁর "শব্দ" শীর্ষক আত্মজীবনীতে প্রকাশিত ঘটনাবলীর পর যা যা ঘটেছে তার এক দীর্ঘ বিবরণী উপস্থাপন করেন: তাঁর মায়ের পুনর্বিবাহ, মায়ের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ, সৎ পিতার ব্যবহার, নির্জনতা ও নৃশংসতার দীক্ষা, এগার বৎসর বয়সে হঠাৎ করে ঈশ্বর-অবিশ্বাসের আত্মোপলব্ধি ,পনেরো বছর বয়সে ধরণীতে অমর হওয়ার চাইতে চিরন্তন উত্তরজীবিতা, পড়াশোনার মাধ্যমে যশ অর্জনের স্বপ্ন যার সঙ্গে আবার জড়িত মৃত্যুর উদ্ভটতা, নিজানের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব, প্রুস্ত ও ভালেরিকে আবিষ্কার, বয়:ক্রম ১৮ থেকে বর্ণনানুক্রমে তাঁর চিন্তাধারা লিখে রাখা, 'একোল্ নরমাল' তথা শিক্ষক-প্রশিক্ষণ মহা-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন, বের্গসোঁ-পাঠে দর্শনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব- অন্য অনেক কথার মধ্যে নীতিবোধ সম্পর্কে তাঁর কার্যক্রম গ্রহণ এবং মাওবাদীদের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক

ঐকমত্য-"আসলে আমি লিখেছি দুই নীতিবোধ নিয়ে; একটি হলো : ৪৫ থেকে ৪৭, সম্পূর্ণভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী, তারপর খসড়া পর্যায়ে '৬৫ থেকে অন্য একটি নীতিবোধ যাতে রয়েছে বাস্তবতার এবং নীতিবোধের সমস্যা।" উপসংহারে তিনি এলেন সেই বিবেচনায় যাকে তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন: ক্লাসিক্যাল (সনাতনী) বুদ্ধিজীবী বনাম নব্য বুদ্ধিজীবী যা তিনি স্বয়ং হতে পছন্দ করছেন।

ছবি শেষ হবার আগেই বেলজিয়াম থেকে তাঁর আমন্ত্রণ এল। সিমন ও সিলভি গাড়িতে ১টায় রওনা দিয়ে সাড়ে ৫টায় পৌঁছে গেলেন। সার্ত্র গেলেন ট্রেনে। তিনি "শ্রেণী বিচার ও জনগণের বিচার" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করলেন অনেক আকর্ষণীয় অঙ্গভঙ্গী ও দৃষ্টান্ত সহকারে। তাঁর মতে, "ফ্রান্সে দু'ধরনের বিচারের অস্তিত্ব রয়েছে তারই একটি আমলাতান্ত্রিক যাতে সর্বহারাকে তার গন্ডির মধ্যে বেঁধে রাখে। অন্যটি হলো জংলী যা চরম মুহূর্তে সর্বহারা এবং সাধারণ শ্রেণীর মানুষ যাতে তাদের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে থাকে প্রলেতারিয়করণের বিরুদ্ধে - সব বিচারের উৎস হলো জনগণ - আমি বেছে নিয়েছি জনগণের বিচার যা সব কিছুর ওপরে এবং যা একমাত্র সত্য।" তিনি আরো বললেন, "একজন বুদ্ধিজীবী যদি জনগণকে বেছে নেন, তাঁর জানা উচিত - বিবৃতি স্বাক্ষরের কাল, প্রতিবাদী শান্ত সমাবেশে বা সংস্কারবাদী সংবাদপত্রসমূহে প্রবন্ধ প্রকাশের সময় শেষ। তাঁর আর বেশি কিছু বলার নেই এবং তাঁর অধিকারে যেসব মাধ্যম আছে তা দিয়ে চেষ্টা করে যেতে হবে যাতে জনগণকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়।" অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করলেন কিন্তু উপস্থিত বুর্জোয়া শ্রোতৃমন্ডলীর মাথার ওপর দিয়ে এসব কথা যেন উড়ে চলে গেল। প্রশ্নোত্তর-পর্বে বামপন্থীদের কাছ থেকে কিছু যথার্থ প্রশ্ন এলেও অনেক বাজে প্রশ্নও এল যা সার্ত্র স্বভাবসিদ্ধ সহজভঙ্গীতে জবাব দিলেন। আনন্দকর অভিজ্ঞতা ছিল আস্‌ক্রুক সমস্তটা চলচ্চিত্রায়িত

করতে পেরেছিলেন। এমনকি সার্ত্রের যে ট্রাউজার খুলে পড়ে যাচ্ছিল এবং তাঁর পাছা দেখা যাচ্ছিল, এমন দৃশ্যও।

পরদিন সার্ত্র ট্রেনে আর্লেৎকে নিয়ে ফিরলেন আর সিমন সিলভির গাড়িতে। প্যারিস ফিরে তাঁরা ওভেরনে-র হত্যাকান্ডের খবর পেলেন। একটা দীর্ঘ ট্র্যাজিক সংগ্রামের কাহিনী, রনো মোটর কারখানার ঘটনা ! সার্ত্র গেলেন, কিছু প্রতিবাদ জানালেন, প্রেস কনফারেন্স করলেন। ২৮শে জানুয়ারি দু'লক্ষ লোকের একটা বিরাট বিক্ষোভ সমাবেশ হলো । সার্ত্র-সিমন তাতেও যোগ দিলেন।

এই পর্বেই মিশেল মঁসো রচিত *লে মাওজঁ ফ্রঁস* (ফ্রান্সে মাওবাদীরা) শীর্ষক গ্রন্থের ভূমিকা লিখলেন। তিনি কঞ্জোর পক্ষে বুদ্ধিজীবীদের একটি বিবৃতিও সই করলেন।

তখন বসন্ত সমাগত। যেমন অপরূপ তেমনি চৈতন্যহীন জড়। ক' দিনেই সূর্য হয়ে যায় গ্রীষ্মের সূর্য-ফুলের কুঁড়ি ফুটে উঠে। গাছপালা সবুজ হয়ে উঠে, পার্কে ফুলের সমারোহ আর পাখি গান গায়;

রাস্তায় পাওয়া যায় নতুন ঘাসের গন্ধ।

পূর্বাপর মোটামুটি একই রূটিন। একবার তাঁর আমেরিকা ফেরত বন্ধু তিতো গেবাস্‌সির সঙ্গে লাঞ্চ করলেন। তিনি ব্ল্যাকপ্যান্থারের দুই নেতার বিরোধের কাহিনী বয়ান করলেন। বুদ্ধিমান ও প্রাণবন্ত ক্লিভার-এর প্রতি সহানুভূতি সত্ত্বেও তাঁর ধারণা হুয়েই হচ্ছে বেশি সিরিয়াস এবং সার্ত্রও তাঁকে অনুমোদন করেন। কিন্তু তথ্যাভাবের কারণে সার্ত্র কোনো পক্ষ গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করলেন।

তাঁরা টড-এর সঙ্গে মধ্যাহ্ন-ভোজনে মিলিত হলেন। অনেক খুঁজে তিনি তাঁর পিতৃপরিচয় জ্ঞাত হয়েছেন। এটা তাঁর জন্য খুবই দরকারী ছিল। তাঁর স্ত্রী, সার্ত্র-সিমনের অতি প্রিয় নিজানের মেয়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর তাঁর সঙ্গে আর দেখাদেখিও নেই। তিনি যেহেতু পাগলপারা হয়ে পিতা খুঁজছিলেন, সার্ত্র সাদরে তাঁকে একটি বই উপহার

দিয়েছিলেন, "আমার বিদ্রোহী পুত্রের জন্য" লিখে। বাস্তব ক্ষেত্রে, পুত্রের পিতা হবার কোন অভিলাষ সার্ত্রের ছিল না। "সত্তর বছরে আত্মপ্রতিকৃতি" রচনায় কোঁতাকে সেকথা জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। টড-এর প্রতি সার্ত্রের বিশেষ কোনো দুর্বলতা ছিলো না, একটু উদার সহানুভূতি প্রদর্শনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। পরে টড-এ বিষয়ে একটি বই লিখেছিলেন।

তাঁরা আবার স্যাঁ-পল-দ্য-ভঁস্ গেলেন এবং এক বছর আগে যে রকম রুটিনে আনন্দমুখর দিন অতিবাহিত করছিলেন, তাই করতে লাগলেন। ট্রানজিস্টর রেডিওতে নিয়মিত ফ্রঁস-ম্যুজিক-এর সঙ্গীত শোনেন আর একদিন কাইঁনে গিয়ে ম্যাগ্‌ৎ গ্যালারি দেখে এলেন। সার্ত্রকে তখন খুবই সুখী দেখাচ্ছিল।

প্যারিসে ফিরে তিনি আবার সংগ্রামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। নগরীতে ১৬৫০০০টি বাড়ি খালি ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার কিছু অভিবাসী এর একটাতে ঢুকে দু দিন ছিল আর পুলিশ এসে মেরে-কেটে সবাইকে তাড়িয়ে দিল। সকুর রুজের প্রতিবাদ সভায় সার্ত্র অংশগ্রহণ করলেন। সার্ত্র এতে বর্ণবাদ ও শ্রেণী সংগ্রাম খুঁজে পেলেন এবং ধনবাদের মুখোমুখি দাঁড়ালেন।

এপ্রিলে হাইডেলবার্গ থেকে প্রকাশিত মানসিক রোগ সংক্রান্ত এক সংকলনের জন্য তিনি পত্র-মুখবন্ধ রচনা করলেন। তাঁর মতে, এই রোগ ধনবাদ-সম্ভব একটি রোগ যেহেতু মার্ক্সিস্ট ধারণায় বিচ্ছিন্নতা যথার্থভাবে মানসিক বিচ্ছিন্নতা এবং নির্যাতন থেকে জন্মে।

বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হওয়া তাঁদের প্রধান বিনোদন। সেই বসন্তে তাঁরা কাথালাদের পেলেন আরেক লাঞ্চে। কাথালা সার্ত্রের কলেজ জীবনের বন্ধু। যুদ্ধের সময় তিনি দ্য গ্যেল অনুসারী ছিলেন। ১৯৪৫ সালে তিনি কম্যুনিস্ট হয়ে যান এবং রুশ থেকে ফরাশি ভাষায় বই অনুবাদ করতে থাকেন। তাঁর স্ত্রী লুসিয়া একটি সাময়িক পত্রে কাজ করতেন। দুজনেই তাঁদের

স্বাধীন মনোভাবের জন্য রুশ কর্তৃপক্ষের শত্রু রূপে পরিগণিত হন। কাথালাদের মতে, সোভিয়েত ইউনিয়নে বুদ্ধিজীবীদের অবস্থা অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে খারাপ।

আবার দাঁতের সমস্যা দেখা দিল। অক্টোবরে তাঁর মুখে নকল দাঁত লাগাতে হবে। তখন কিছু সময় তাঁর পক্ষে বক্তৃতা করা সম্ভব হবে না। এদিকে স্মৃতি ভ্রংশও দেখা দিচ্ছে। সার্ত্রের মৃত্যুচিন্তার উদয় হলো একটু একটু, বিশেষ করে শনিবার সিমন ও সিলভির সঙ্গে একত্র হলে। *লিবর* (স্বাধীন) পত্রিকায় প্রকাশিত হলো একটি সাক্ষাৎকার: "রাজনৈতিক সমস্যা ও বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা।" মে মাসের *লা কোজ দ্য প্যপল* পত্রিকায় জনগণের শাসন সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধারা ব্যাখ্যা করেন।

শ্রান্তি-ক্লান্তি আবার ঘিরে ধরলো সার্ত্রকে। এক সন্ধ্যায় গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। আরেকবার শুধু এক পেগ হুইস্কি পান করে তিনি বিড়বিড় করতে লাগলেন। ঘুম থেকে ওঠালে তিনি হেলে দুলে চললেন। পরদিন সকাল আটটায় জাগালে তাঁকে খুবই স্বাভাবিক দেখা গেল। সিমন একরাতের জন্য গ্রনোবল যাচ্ছিলেন বিমানে। পছন্দ করা বিষয়ে তাঁকে বক্তৃতা করতে হবে। চিন্তিত- চিত্তে তিনি ফিরলেন, আর্লেৎ সে রাতে প্যারিসে ছিলেন না। সার্ত্র একা আর্লেৎ-এর বাড়িতেই রাত কাটিয়েছিলেন টেলিভিশন দেখার জন্য। তাঁর বাড়িতে টেলিভিশন ছিল না। ফিরে এসে আর্লেৎ তাঁকে বেহুঁশ ঘুমুতে দেখলেন ফ্লোরে। আবার ডাক্তার, আবার পুরোনো ঔষধপত্র ।

শনিবার সুস্থ হলেন সার্ত্র। বন্ধ হয়ে যাবার মতো অবস্থা থেকে *লা কোজ দ্য প্যপল* আবার বেরুল। জুলাইর শুরুতে আর্লেৎকে নিয়ে সার্ত্র একটি সংক্ষিপ্ত সফরে গেলেন অস্ট্রিয়ায়। সিমন ও সিলভি গেলেন বেলজিয়াম, হল্যান্ড ও সুইটজারল্যান্ডে। সার্ত্র টেলিগ্রাম করেন, কখনো টেলিফোন করেন। স্বাস্থ্য ভালো, উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই। ১২ই আগস্ট

সিমন তাঁকে রোমের রেলস্টেশনে আনতে গেলেন। কিন্তু পেলেন না, একটু পর দেখা গেল, সার্ত্র আসছেন একটা ট্যাক্সিতে। অবস্থা ঢুলু ঢুলু। "কিছুক্ষণের মধ্যে কেটে যাবে"–সার্ত্র সিমনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন। একলা হবার কারণে তিনি ট্রেনের রেস্তোরাঁয় গিয়ে দুটি হাফ-বোতল মদ খেয়ে ফেলেছিলেন। সুযোগ পেলেই এই কাণ্ডটি করে থাকেন। কেন? সেটিই সিমনের প্রশ্ন। "ভালো লাগে তাই", সার্ত্রের জবাব। সিমনের মনে হলো আসলে নিজের কাজের ওপর সন্তুষ্ট না থাকলে সার্ত্র এমনটি করে থাকেন। ফ্লোবের চতুর্থ খণ্ডে তিনি *মাদাম বোভারী* নিয়ে লেখার কথা। সবসময় নতুন ভাবনায় উদ্দীপ্ত সার্ত্র সেবার 'স্ট্রাকচারালিস্ট মেথড' ব্যবহার করবেন ভেবেছিলেন। অথচ তিনি কাঠামোবাদ পছন্দ করেন না। তিনি ব্যাখ্যা করলেন: "ভাষাবিজ্ঞানীরা চান ভাষার বহিরঙ্গ বিশ্লেষণ, আর কাঠামোবাদীরা ভাষাবিজ্ঞানজাত, সর্বাত্মকভাবে বাইরে থেকে তা করে থাকেন। তাঁদের জন্য দূরবর্তী এইসব ধারণাই তাঁরা ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু আমি তা করতে পারি না। কারণ আমি নিজেকে বিজ্ঞানীর নয়, দার্শনিকের ভূমিকায় রাখতে চাই এবং সেজন্য যা অখণ্ড তাকে সর্বতোভাবে বাইরে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই।"

অতএব, এক হিসাবে তাঁর প্রকল্প যে ভাবে গৃহীত হয়েছিল তা তাঁকে পীড়িত করছিল, তিনি হয়তো ভেবে থাকবেন যে প্রথম তিন খণ্ডে *মাদাম বোভারীর* ব্যাখ্যা একরকম রয়েছে, এখন আর কিছু লিখতে গেলে পুনরাবৃত্তি ঘটে যাবে। এ নিয়ে তিনি ভেবেছিলেন, নোটও করছিলেন, কিন্তু ক্রমশ নিজের আগ্রহ হারিয়ে ফেলছিলেন। ১৯৭৫ সালে তিনি মিশেল কোঁতাকে বলেছিলেন, "সেই চতুর্থ খণ্ডটি আমার জন্য একদিকে সবচেয়ে জটিল এবং অন্যদিকে তার প্রতি আমার আর্কষণও এখন সবচেয়ে কম।" নানা বিষয়ে আলোচনা, সভা,গান শোনা ছাড়াও রোমে খুব স্ফূর্তিতে কাটিয়েছেন সার্ত্র। দুজনে তাশও খেলেছেন প্রবল উৎসাহে।

সেপ্টেম্বরে সুস্বাস্থ্য নিয়ে প্যারিসে ফিরলেন দু জন। নিরুদ্বিগ্ন। কিন্তু অক্টোবরের মধ্যভাগে সিমন বার্ধক্যের হতবলের ব্যাপারে সচেতন হলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, রোমে দুপুরের খাবারের পর তাঁরা যখন গিওলিত্তির দোকানে অসাধারণ আইসক্রিম খেতে যেতেন সার্ত্র তখন খুব দ্রুত টয়লেটে ঢুকে পড়তেন। এক বিকেলে সার্ত্র, সিমন ও সিলভি যখন হোটেলে ফিরে আসছিলেন, সার্ত্র আগে দ্রুত হাঁটছিলেন হঠাৎ থেমে বললেন,"ওপর থেকে বিড়াল পেশাব করে দিয়েছে । আমি ভিজে গেছি মনে হচ্ছে।" পরে একদিন সিমনের বাড়িতে সার্ত্র চেয়ারে দাগ রেখে উঠে পড়লেন। পরের দিন আবার একই কান্ড। সিমন সার্ত্রকে বললেন: "আপনার পেশাবের সমস্যা হচ্ছে। ডাক্তারকে বলা দরকার তো!"

সার্ত্র জবাব দিলেন: "সে তো বলেইছি তাঁকে । বহু দিন ধরেই এটা হচ্ছে। আমি *সেলুল* হারিয়ে ফেলেছি।" সিমন অবাক। সার্ত্র অবশ্য সবসময় ভয়ানক রক্ষণশীল। প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে তিনি কখনো সামান্যতম ইঙ্গিতও করতেন না। গোপনীয়তার ব্যাপারে খুবই সাবধান। সিমন পরদিন জিজ্ঞেস করলেন, "এটা যে কন্ট্রোল করতে পারছেন না এতে বিরক্তি হচ্ছে না?" তিনি হেসে জবাব দিলেন, "বুড়ো হয়ে গেলে কিছু জিনিষ মানিয়ে নিতে হয়!" তাঁর সরলতায় সিমন বাকতাড়িত। এটা একেবারে নতুন, তাঁর জেদী ভাবের অভাব, অবসন্নতা দেখে ব্যথিতও হলেন ।

তখন তাঁর প্রধান সমস্যা দাঁতে। পরদিন সকালে তাঁর ওপরের কয়েকটা দাঁত ফেলে দেওয়া হলো। তারপরদিন ওপরের বাকিগুলোও তুলে ফেললেন দন্ত্য চিকিৎসক। দুদিন পর নতুন বাঁধানো দাঁত নিয়ে কথা বলতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না । ২৬শে নভেম্বর তাঁরা সার্ত্রের ওপর তোলা ছবির চিত্রায়ন দেখতে গেলেন। সেখানে অনেক ছবিতে তাঁকে যৌবনের প্রতিমূর্তিরূপে প্রতিভাত হলো। সিমন ভাবলেন, হায়রে,

এই লোকটির জন্য পুরো গ্রীষ্ম তাঁকে বিস্তর চোখের পানি ফেলতে হয়েছে।

এ সময়ে তিনি *লা কোজ-দ্য প্যপল* পত্রিকা নিয়ে ব্যস্ত থাকলেন, তাঁর বন্ধুদের নিয়ে একটা বড় বিবৃতি ছাপলেন: "আমরা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতিকে দায়ী করি।" সেটি পোস্টার রূপে বিলি করা হলো। আরো ৩৬ জন বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তিনি "নতুন বর্ণবাদ" শীর্ষক এক বিবৃতি প্রকাশ করলেন। এছাড়া তাঁর একটি ইন্টারভিউ প্রকাশিত হলো ২২শে নভেম্বর যা সরকারী মহলে খুব হুলুস্থুল ফেলে দিল। পরে '৬৮ পরবর্তী বাম চিন্তাধারা নিয়ে তিনি সিরিজ সাক্ষাৎকার দিতে থাকলেন যার শিরোনাম হলো: "অনা রেজোঁ দা স্য রেভল্‌তে" (বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত)।

আরেকটি সাক্ষাৎকারে তিনি বললেন, 'আমার জন্য' ৬৮ এসেছিলো একটু বিলম্বে, আমার বয়স যখন ৫০ ছিল তখন এলে ভালো হতো। প্রয়োজনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত যাবার জন্য একজন বুদ্ধিজীবীর পয়তাল্লিশ-পঞ্চাশই যথেষ্ট।" ...তরুণ সংগ্রামী বুদ্ধিজীবীরা এই সময় তাঁর চারপাশে গিজগিজ করছিল।

আসলে সার্ত্রের স্বাস্থ্য ইতিমধ্যে আরো একবার খারাপের দিকে গিয়েছিলো। একবার বিছানা থেকে পড়ে গেছেন (১৫ই জুলাই)। হাত আরো একটু অবশ । ঠোট বাঁকা, কথাবার্তা অস্পষ্ট । সুস্থ হয়ে উঠতেই তিনি ইতালী গেলেন বেড়াতে। ওয়ঁদার কাছে নাপল থাকলেন। পম্পেই গেলেন। তারপর রোম। সিমনের সঙ্গে ভালোই কাটছিলো। সিলভিও কাছে ছিলেন। গাড়িতে চড়িয়ে তিনি বেড়াতে নিয়ে যেতেন। সার্ত্র "ফ্লোবের-৩"-এর প্রুফ দেখছিলেন। তাছাড়া ইতালীর পত্রিকা পড়ে সময় কাটাতেন।

প্যারিসে ফিরে এলে তাঁর স্বাস্থ্যের একটু উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল। কিন্তু অবসন্নতার ছাপ সর্বত্র। অবশ্য মানসিকভাবে তাঁকে যথেষ্ট দীপ্ত দেখাচ্ছিল। বিভিন্ন ব্যক্তি বা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ পূর্ববৎ। "ফ্লোবের-৩"

ছাপতে দিয়ে তিনি চতুর্থ খন্ডে হাত দিয়েছেন। এতে *মাদাম বোভারী* সম্পর্কে লিখবেন। সিমনের পরবর্তী গ্রন্থ *তু কোঁৎ ফে* (সব হিসাব-নিকাশের পর) সম্পর্কে খুব ভালো কিছু উপদেশ দিলেন। সিমনের দুশ্চিন্তার উপশম হলো।

নভেম্বর শেষে তিনি (মিশেল) ফুকো ও জঁ জনের সঙ্গে জালালী হত্যার বিরুদ্ধে আয়োজিত এক বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করলেন। পনের বছরের ছেলে, আলজেরীয় কিশোর জালালী। ২৭শে অক্টোবর তার বাড়ির কৌসিয়েরজ (কেয়ারটেকার) তাকে বন্দুকের আঘাতে হত্যা করেছে। সে নাকি খুব শোরগোল করছিলো এবং তাকে চোর মনে হয়েছিলো। বিক্ষোভ-সভায় সার্ত্রকে চিনতে পেরে পুলিশ কোন বাধা দিল না। তিনি বক্তৃতা করলেন এবং একটি জালালী কমিটি গঠন করলেন।

১লা ডিসেম্বর সন্ধ্যায় হঠাৎ করে সার্ত্র সিমনকে বললেন, "আমার স্বাস্থ্য-শক্তি শেষ। সত্তর পার হতে আর পারবো না আমি । ... ফ্লোবের বইটা আমি শেষ করতে পারবো বলে মনে হয় না।" ... সে সময় তিনি তাঁর শেষকৃত্য সম্পর্কেও কিছু কথা বললেন-সেটা হবে খুব সাধারণ এবং দাহ। অবশ্যই যেন তাঁকে মা ও সৎ বাবার মধ্যে *পেরলাশেজ* কবরস্থানে দাফন করা না-হয়। তাঁর শব মিছিলে যেন বেশ কিছু সংখ্যক মাওবাদীরা অনুগমন করে। পরে ১২ই জানুয়ারি '৭২ তিনি অবশ্য বললেন: "ওহ! আরো দশবছর আমি থাকতে চাই এখানে।"

১৯৭৩

লিবারেশান পত্রিকা চালু করার জন্য তিনি "রেডিওস্কপি" নামে একটি সাক্ষাৎকার দিলেন ৭ই ফেব্রুয়ারী। একই কারণে তিনি এক সভা উপলক্ষে লিওঁ, অন্য এক সভার জন্য সিমন সহ লিল্ শহরে যান।

আরো বহু কর্মকান্ডে তিনি জড়িত: বইয়ের ভূমিকা রচনা, দেশী-বিদেশী সাক্ষাৎকার এবং 'আধুনিক সময়'-এর বিভিন্ন বৈঠকে তিনি বেশ নিয়মিত। মার্চের প্রথম সপ্তাহে তাঁর শরীর আবার খারাপ হলো। আর একটা এ্যাটাক হলো। তাঁকে একজন নিউরোলজিস্টকে দেখানো গেল। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ঔষধপত্র দেওয়া হল; এলকোহল ও ধুমপান নিষিদ্ধ। কিন্তু সার্ত্র তা মানছেন না। পরদিন তিনি মানুষ চিনতে পারছেন না। ডাক্তারের মতে, তাঁর 'আনক্সি' হয়েছে অর্থাৎ মগজের 'আসফিক্সি' যা অংশত তামাকের জন্য। তাঁর রক্তচলাচল বেশি কার্যকর ছিলনা। তাঁকে মিদি অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হল। বেশ কিছুদিন তিনি কথাবার্তা বললেন একটু উলটা-পালটা।

এপ্রিলের গোড়ার দিকে তিনি কিছুটা সুস্থ হলেন। তাঁর "ল্য ম্যুর" (দেয়াল) সম্পর্কে একটি সমালোচনা পড়ছিলেন। কাজ করতে না পারার জন্য দু:খ প্রকাশ করলেন সার্ত্র। *দা ন্যু ইয়র্ক রিভিউ অব বুকস*-এর জন্য ভিয়েতনামের যুদ্ধত্যাগী মার্কিনীদের ক্ষমা প্রদর্শনের দাবী জানিয়ে একটি পত্রও লিখলেন।

কয়েকদিনের জন্য আর্লেৎ-এর সঙ্গে জুনাস গেলেন। সিলভি এবং সিমন গাড়ি নিয়ে সেখান থেকে তাঁকে স্যাঁ-পল-দ্য -ভঁস নেবার জন্য রওনা দিলেন। বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম হলেও সার্ত্রের চেহারা ও আচরণ সুবিধার ছিল না।

স্যাঁ-পল পৌঁছার পর অবস্থার উন্নতি হলো। আবহাওয়া সুন্দর, গাড়িতে নীস,কাইঁন, কান, মুগ্যাঁ, ঘুরতে সবারই খুব ভালো লাগলো। সিমন এক পর্যায়ে মন্তব্য করলেন: "পিকাসো একানব্বুই বছর বয়সে মারা গেছেন। আপনার জন্য তা আরো চব্বিশ বছরের জীবন।" সার্ত্র জবাব দিলেন, "চব্বিশ বছর খুব বেশী নয়।"

প্যারিসে ফিরে ডা: বি. তাঁকে দেখলেন। সবই উত্তম, কেবল জ্বর-মাত্রা ২০-১২। সার্ত্র এসে মিষ্টি সরলতায় বললেন, "আমি কিন্তু বোকা নই, তবে শূন্য।" বি. তাঁকে ঔষধের মাত্রা কমিয়ে দিলেন, একটি

স্টিমুলেন্ট দিলেন এবং উপদেশ দিলেন, সার্ত্র যেহেতু সিরিয়াস কিছু লিখতে পারবেন না, তাই তাঁর উচিত হবে কবিতা লিখতে চেষ্টা করা। শুনে খুব রেগে গেলেন তিনি।

অবস্থা ওঠা-নামা করছিলো। এই ভাল, এই মন্দ। সিমন প্রায় শুভসন্ধ্যা যাপন করছেন তাঁর সঙ্গে। তবে রোববার সিলভির সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনটা ছিল খুব আনন্দের। তিতো গেবাস্‌সি তাঁর রাজনৈতিক জীবন নিয়ে বই লিখবেন, তাই সিমনসহ সার্ত্রের সঙ্গে লা কুপলে দুপুরে খেয়ে মুখোমুখি আলোচনায় বসলেন। ২১শে মে সার্ত্র পিয়ের ভিক্তর ও গাভির সঙ্গে পুরনো সাক্ষাৎকার সিরিজ আবার শুরু করলেন এবং লিলিয়ানকে তাঁরা বলে গেলেন: "তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান: একেবারে আগের মতো।" 'আধুনিক সময়ে'র সভায়ও তাঁকে আগের মতোই মনে হচ্ছিলো, শুধু কিছু নামের বেলায় ইতস্তত: করতে দেখা গেল। ১৭ই জুন ফ্রঁসিস জঁসো-র সঙ্গে তাঁর কৈশোর-উত্তীর্ণকালের উপর একটি সাক্ষাৎকার দিলেন। সহিংসতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ওপরও বক্তব্য স্পষ্ট করলেন।

এখন শুধু চোখের অবস্থা খারাপ। বিশেষজ্ঞ জানালেন যে, দৃষ্টির ক্ষেত্রে দশভাগের মধ্যে চার ভাগ গেছে। প্রায় অর্ধেক। শুধু একটা চোখ ঠিক আছে। পনেরো দিন চিকিৎসাধীন থাকতে হবে। ভালো ফল না পেলে একটা ছোট অপারেশন লাগবে। জুনের তৃতীয় সপ্তাহে দেখা গেল স্বাস্থ্যের ও চোখের অবস্থা মোটামুটি ভালো। সিমন ও সিলভি তিন সপ্তাহের জন্য মিদি চলে গেলেন। সার্ত্র রইলেন আর্লেৎ- এর দায়িত্বে। খবর ভালো পাওয়া যাচ্ছিলো। ২৯শে জুলাই তাঁরা মিলিত হলেন জুনাসে এবং চললেন ভেনিসের পথে। সেখানে ওয়ঁদা থাকবে। সিমন সার্ত্রের চেহারা দেখে অনেকটা বিমর্ষ। ঠোঁট ঝুলে পড়েছে, মুখ বাঁকা, দৃষ্টিশক্তির অভাবে মুখাকৃতি শক্ত। অনেকটা বুড়িয়ে গেছেন। ফ্রান্সের বেশ কিছু এলাকা ঘুরে তাঁরা ভেনিস এলেন। সার্ত্র খুব উপভোগ করলেন কারণ ভেনিস তাঁর খুব পছন্দ। সিলভির সঙ্গে সিমন ফ্লোরেন্স চলে

গেলেন এবং ১৫ই আগস্ট রোম এসে পৌঁছুলেন। ১৬ তারিখ বিকেলে সার্ত্র এসে পৌঁছুলেন। চোখের সমস্যা বাড়লো। রোমের সেরা চোখের ডাক্তারকে দেখানো হলো। কয়েকবার দেখানোর পর সম্মানী দিতে গেলে ডাক্তার কিছুতেই নেবেন না। তাঁর দাবী: সার্ত্রের স্বাক্ষরিত একটি বই। সার্ত্র তিনটি বই তাঁকে দিলেন। ডাক্তারটিকে তাঁর খুব পছন্দ হয়েছিলো।

সিমন তাঁকে ফরাশি ও ইতালীয় সংবাদপত্র এবং কিছু বই পড়ে শোনান। তাঁর পেশাবের সমস্যা আর নেই। এলকোহল, কফি, চা তিনি পরিমিত পান করে থাকেন ইদানীং, কিন্তু ' পাতে' এবং আইসক্রিম খাচ্ছেন মনের সুখে। অথচ তিনি তখন বহুমূত্র রোগের দ্বারপ্রান্তে।

বুদ্ধিবৃত্তিগতভাবে তিনি খুবই প্রাণবন্ত ~~ছিলেন~~। স্মৃতি সজাগ তবে প্রায়ই তিনি যেন অন্যমনস্ক হয়ে যান। এতে সিমন কখনো ভীষণ বিরক্ত হন, আবার কখনো তাঁর চোখে পানি এসে যায়। তিনি সার্ত্রকে নিবেদিত "আউত আউত" সাময়িকী অনুবাদ করে শোনান। তাতে ১৯৬১ সালে গ্রামসি ইনস্টিটিউটে -প্রদত্ত সার্ত্রের "সাবজেক্টিভিটি ও মার্কসিজম" শীর্ষক বক্তৃতা এবং তাঁর সম্পর্কে লেখা ছিল। তাছাড়া লেলিও বসো ও রোসানা রোসান্দা-র সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হল। ৫ই সেপ্টেম্বর পূর্ব-পরিচিত জর্মন সাংবাদিক আলিস শোয়ার্জের এসে দেখা করলেন (সার্ত্র ও সিমনের সহানুভূতি ঘিরে ছিল মহিলাকে)।

সিমনের ওপর তিনি ছোট্ট একটা ছবি করছিলেন। আলিস আর প্যারিস থেকে আসা বন্ধু বোস্ত সহ আনন্দমুখর নৈশ-ভোজন করলেন তাঁরা। রোম ছেড়ে যেতে সিমনের খারাপ লাগছিল কেননা তাঁর কেবল মনে হচ্ছিল: "আর কি কখনো আসা হবে?"

সার্ত্রের বাড়ি বদলানো হলো। একটু বড়, তবে একই এগারো তলায়। অবশ্য লিফট আছে দুটো। সার্ত্রের লেখাপড়ার কামরাটির সামনে রয়েছে মোপারনাস টাওয়ার এবং অদূরে এয়ফেল টাওয়ার।

শোবার ঘর দুটো, যাতে রাতে তাঁকে একলা থাকতে না হয়। সার্ত্র খুশি। তখনো পড়তে পারেন না। তবে রাজারানী তাশ খেলতে পারেন। তিনি সিমনদের সন্তোষ উৎপাদনের জন্য বলে ওঠেন: "আমি যে বেশ মোটা হয়ে গেছি এটা কিন্তু আমার ব্যারামের জন্য" দুপুরে খেতে যাবার সময় বলেন, "জোরে হাঁটবেন না। আমি পা চালিয়ে আসতে পারছি না অসুস্থ বলে।" সিমন তখন বলেন, "কিন্তু আপনি অসুস্থ নন।"-"তাহলে আমার কি হয়েছে? খর্বাকৃতি হয়ে গেছি কেন?" সিমন মর্মাহত, তবু বললেন: "অবশ্যই না, আপনার পা টা একটু দুর্বল হয়ে পড়েছে". . . এদিকে চোখের অবস্থা আরো খারাপ। লিফটও অচল।

২৬শে সেপ্টেম্বর চিলিতে নির্যাতনের বিরুদ্ধে লেখকদের একটি প্রতিবাদ লিপিতে স্বাক্ষর দিলেন তিনি। ৮ই অক্টোবর একটি মামলা ছিলো সার্ত্রের বিরুদ্ধে। ১৯৭১ সালের মে মাসে *মিন্যুৎ* পত্রিকা তাঁর কিছু লেখার জন্য জেল ও জরিমানা ৮,০০০০০ ফ্রঁ ক্ষতিপূরণ দাবী করে। লম্বা সওয়াল-জবাব আর বক্তৃতার পর আদালত মামলা খারিজ করে দেয়। তবে সার্ত্রের এক ফ্রঁ ক্ষতিপূরণ এবং ৪০০ ফ্রঁ জরিমানা হয়। সার্ত্রের দলবল এতে খুশি হয়ে বাড়ি ফেরে।

এর ক' দিন পর সার্ত্র সিমনকে *দোম* রেস্তোরাঁয় যাবার পথে জিজ্ঞেস করেন "আমাকে কি খুব অথর্ব দেখায়?" চক্ষু বিশেষজ্ঞ খুব খারাপ কথা শোনালেন, দৃষ্টি ফিরে পাবার কোন ভরসা আর নেই। তবে চশমার দোকানে একটা বিশেষ যন্ত্রের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে যা দিয়ে পার্শ্বগত দৃষ্টিশক্তি দিয়ে দিনে একঘন্টা পড়তে পারবেন। সিমন তাঁকে বলেন, "মামলার কারণে তিনি হয়তো হয়রান হয়ে পড়েছেন।" সার্ত্র জবাব দেন, "না মামলা নয়, ডাক্তার দেখানোর কারণে।" আসলে ডাক্তার নয়, চক্ষু বিশেষজ্ঞের ওপর সার্ত্রের ভয়ানক রাগ।

১২ই অক্টোবর হাসপাতালে তাঁর পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষা হলো। ডা: বি. সিমনকে জানালেন, বেশ ক' মাস সার্ত্রের পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়।

১৬ই অক্টোবর সিমন তাঁর সঙ্গে চশমার দোকানে গেলেন। সেই বিশেষ যন্ত্রের অর্ডার দেয়া হল। পরে যন্ত্রটি আনা হলে দেখা গেল সেটা অব্যবহারযোগ্য। আগের মত পড়েই শোনাতে হলো।

একদিন তিনি তাঁর অনুরাগীদের বললেন, "আমি বর্তমানে ইসরায়েল যে ভাবে আছে তার পক্ষপাতী নই। তবে তা ধ্বংস হয়ে যাক সেটাও আমি মেনে নিতে পারি না। কেউ প্রো-আরব হতে পারে না, একটু প্রো-ইহুদি না হয়ে, আবার কেউ প্রো-ইহুদি হতে পারে না, প্রো-আরব না হয়ে- যেমন আমি। তাহলে এটি হবে এক হাস্যকর পরিস্থিতি।"

২৬শে অক্টোবর সার্ত্র এলি বেন্ গালকে টেলিফোনে একটি সাক্ষাৎকার প্রদান করলেন। কিপ্পুর-এর যুদ্ধের পর তিনি ঘোষণা করলেন: "আমার অভিপ্রায় এটা যে, ইসরায়েলীরা অনুভব করুক- ফিলিস্তিনী সমস্যা হল আরব যুদ্ধের মূল কারণ। *লিবারেসিঁও* পত্রিকার জন্য সিমনকে দিয়ে লিখিয়ে একটা বাণী পাঠালেন: "এই যুদ্ধের ফলে মধ্যপ্রাচ্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দূরীভূত হলো।"

এক সন্ধ্যায় র‍্যু মুফতার-এর একটি ছোট থিয়েটারে *আমার দেশের বিচার ব্যবস্থার ওপর আমার আস্থা আছে শীর্ষক* একটা ভালো নাটক দেখলেন। এবং বিভিন্ন সময়ে সার্ত্র উৎসাহের সঙ্গে হাততালি দিলেন।

তাঁর বাড়িতে হোক বা অন্যত্র হোক বিভিন্ন আলোচনা তাঁকে যথেষ্ট ক্লান্ত করতো। তিনি প্রায় বিকেলে ঘুমিয়ে পড়তেন। *মাদাম বোভারী* সম্পর্কে লেখা তাঁর দুটি ভিন্ন বক্তব্যের রচনা সিমন তাঁকে পড়ে শোনান। আরেক সন্ধ্যায় তাঁকে অরেস্ট পুসিয়ানি (ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সার্ত্র বিশেষজ্ঞ)-র লেখা "সার্ত্রের নন্দনতত্ত্ব" প্রবন্ধ পড়ে শোনানো হল। এটি তাঁকে প্রচুর আনন্দ দেয়।

তাঁর নতুন বাড়ি খুব কাছে, তাই টেলিফোনও লাগানো হল না। সিমন সেখানে ৫ এবং আর্লেৎ ২ রাত শুতে যেতেন।

এক শনিবার সন্ধ্যায় তাঁরা জিজেল হালিমির বাসায় কুসকুস খেতে গেলেন। তিনি কোন কথা বললেন না। দুপুর বেলা লেনাকে নিয়ে খেতে গেলেও তিনি চুপচাপ থাকলেন।

নতুন এক ডাক্তার দেখানো হল। তিনি ধূমপান থেকে বিরতি গ্রহণের ব্যাপারে জোর দিলেন। সার্ত্র বেরিয়েই বললেন যে তিনি কিন্তু ধূমপান করেই যাবেন। অবশ্য পরদিন থেকে দেখা গেল যে তিনি মাত্রা কমিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আবার বাড়িয়েছেনও । এর আগে বহুমূত্রের বিশেষজ্ঞ একজনের সঙ্গে পরামর্শ করা হলে তিনি ফলের জুস খাওয়া বন্ধ করালেন।

এক সন্ধ্যায় লা ক্লশদার রেস্তোরাঁয় খুব মৌজের সাথে তমিকো, সিলভি ও সিমন সার্ত্রের সঙ্গে নৈশ- ভোজন করলেন। সিমন তাঁকে পড়ে শোনালেন তাঁর সম্পর্কে প্রকাশিত কিছু রচনা। তিনি শুনে বললেন: "ন্যায়সংগত।"

এই সময়ে তিনি পিয়ের ভিক্তরকে সেক্রেটারী করলেন যদিও প্যুইগ নামে তাঁর এক সেক্রেটারী তখন কর্মরত ছিলো। অবশ্য ভিক্তরের কাজ পড়ে শোনানো ও তাঁর সঙ্গে অন্য কাজ করা। লিলিয়ান এতে খুব খুশি। কিন্তু আর্লেৎ অখুশি। তাঁর ধারণা রাসেল ট্রাইবুনালের সময় রাসেলের সঙ্গে যেমন তাঁর সেক্রেটারী শনমান যা করেছে তার মত যেন না-হয়। কিন্তু সার্ত্র সানন্দে ভিক্তরকে নিয়ে কাজ চালিয়ে গেলেন। সিমনের কিছু ফুরসত মিললো সকালবেলা পড়ে শোনানোর কাজ থেকে অব্যাহতি পাওয়ায়।

ডিসেম্বর শুরুতে দেখা গেল তাঁর অবস্থা খুব খারাপ না হলেও খুব ভালোও না। ঘুম বেশি। এমনকি সকালেও তিনি ঘুমিয়ে থাকছেন। এক বিষ্যুদবার সিমন তাঁকে এক কমবয়স্ক চক্ষু বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে গেলেন। খুবই সহানুভূতিশীল, কিন্তু অবস্থা খারাপ। বেরিয়ে আসার পথে সার্ত্র আবার তাঁকে বললেন, "তাহলে আমি কি আর পড়তে পারবো না?"

গামা-এন সেফালোগ্রাম পরীক্ষায় তাঁর ব্রেইনে অস্বাভাবিক কিছু দেখা গেল না। কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি বেশ হাস্যকর শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলেন। এক সকালে, তাঁকে কিছু ঔষধ খাওয়াচ্ছিলেন সিমন। হঠাৎ তিনি বললেন: "আপনি একজন ভালো বধূ বটে।" ১২ই ডিসেম্বর 'আধুনিক সময়ে'র বৈঠকে তাঁকে ঘুম কাতুরে দেখা গেল। আবার বিকেলে সিমন *ল মোঁদ* পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ওপর লেখা বইয়ের সমালোচনা যখন পড়েন তখন মনোযোগের সঙ্গে শোনেন।

তাঁর নতুন বাসা গোছানোর কাজে একটু সময় লাগলো। বর্ষশেষের অনুষ্ঠান হল সিমনের এপার্টমেন্টে। খুবই আনন্দোচ্ছল ছিলেন তিনি সিলভি ও সিমনকে নিয়ে।

১৯৭৪

সার্ত্রের স্বাস্থ্য এখন অনেক ভালো। কিন্তু তিনি উদ্বিগ্ন তাঁর দৃষ্টি নিয়ে। সিমনকে তাঁর জিজ্ঞাসা: "আমি কি কখনো আমার চোখ ফিরে পাব না?" সিমন তাঁর আশঙ্কার কথা বললেন। তাঁর প্রশ্নেও থাকত আশা ও আশঙ্কার কথা। একটা পুরো রাত কেঁদে কাটালেন সিমন। এক পর্যায়ে দেখা গেল তিনি ধূমপান বন্ধ করেছেন। সিমন আবার দেখা করতে গেলেন ডা.সিওলেক-এর সঙ্গে। তিনি বললেন, "সার্ত্র একেবারে অন্ধ হবেন না। কিন্তু যাকে বলে সুদৃষ্টি, সেটা তিনি আর কখনো ফিরে পাবেন না।"

পুরোনো সহকর্মী দু জনের সঙ্গে সার্ত্র *লা ফ্রঁস সোভাজ* (বন্য ফ্রান্স) সিরিজের বই প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন । আশাবাদ, মানবিকতা ও স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে এই প্রয়াস।

১৭ই মার্চ তাঁরা লেস্ত্যুরঁজ নামে পোয়াসির এক রেস্তোরাঁয় মধ্যাহ্ন-ভোজন উপলক্ষ্যে গেলেন যেখানে যৌবনে তাঁরা প্রায় যেতেন। সেন নদীর তীরে বিশাল বৃক্ষ সমৃদ্ধ এলাকা এবং চমৎকার খাদ্যবস্তুর সমাহার। সন্ধ্যায় তিনি ও আর্লেৎ জুনাস চলে গেলেন। ক' দিন পর

আভিইঁনোঁতে তাঁরা একত্র হলেন। ভেনিসের পথে তাঁরা ট্রেনে মিলান এসে পৌঁছুলেন। সেখানে উঠলেন হোটেল স্কালায় যেখানে ১৯৪৬ সালে সার্ত্র ও সিমন মধুর দিবস-রজনী অতিবাহিত করেছেন। পরে ভেনিস এসে তাঁরা নিলেন হোটেল মনাকো। হোটেলটি হচ্ছে সেন্ট মার্ক স্কোয়ারের কাছে গ্র্যান্ড ক্যানালের তীরে। সকালে সার্ত্রের কক্ষে গিয়ে ব্রেকফাস্ট, তারপর কিছু পড়ে শোনানো, একটার দিকে একটি স্যান্ডউইচ তারপর সার্ত্রকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে সিলভি ও সিমন একটু ঘুরে বেড়ালেন। ৫টার দিকে সার্ত্রকে নিয়ে তিনজনের বিভিন্ন এলাকা পরিভ্রমণ। সার্ত্র বেশ ভালো রয়েছেন ভেনিসে।

বাধ সাধলো একটা পত্রিকা। হোটেলের নামোল্লেখ করে তাঁদের ফটো ছাপা হয়ে গেল সেটাতে। অমনি ভীড় করে লোক আসতে লাগলো দেখা করার মানসে। অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। তবে মজার ব্যাপার হলো, তাঁদের প্রকাশকের ছেলে মন্দোদরি হঠাৎ ফোন করলেন। ১৯৪৬ সালে তাঁরা একত্রে ইটালী ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি এখন দাড়ি রেখেছেন। একটু বার্ধক্যের ছাপ। সঙ্গে একজন অপেরার অর্কেস্ট্রা-প্রধান। পরদিন তাঁদের আমন্ত্রণে রাজকীয় বক্সে বসে চমৎকার *মাফিয়া দি রোগান* শীর্ষক দানজিত্তির অপেরাটি উপভোগ করলেন। অবশ্য দুর্ভাগ্য সার্ত্রের, তিনি দেখতে পেয়েছেন একটি কালো গর্ত।...

২রা এপ্রিল তাঁরা ট্রেনে উঠলেন। সকাল বেলা ব্রেকফাস্ট নিয়ে এসে স্টুয়ার্ড জানালো যে, ফরাশি প্রেসিডেন্ট পোঁপিদু মারা গেছেন। ফরাশি যাত্রীদের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। প্যারিসে ফিরে সার্ত্র কয়েকদিন সিমনের বাড়িতে রইলেন। এরমধ্যে একদিন চোখের ডাক্তারের কাছে গেলেন। চোখের প্রেসার ভালো। সার্ত্র খুব খুশি: "মোটামুটি আমার ভালোই যাচ্ছে, সবই ঠিকঠাক আছে।"... তবে ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনায় তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর চোখ আর কখনো পূর্ণ দৃষ্টি ফিরে পাবে না। সিমন বললেন : "না ,আপনি পুরোটা

আর ফিরে পাচ্ছেন না।" সার্ত্র প্রথমবারের মতো চোখের ডাক্তারের ওপর বিদ্বেষহীনভাবে কথা বললেন এবং ভেনিসে যে ধারণা হয়েছিলো পুরো অন্ধ হয়ে যাবেন তা থেকে রক্ষা পেলেন। একবার বহুমূত্র বিষয়ের বিশেষজ্ঞ অন্য একজন প্রফেসর পুরোনো ডাক্তার দেখিয়ে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতির ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তিনিও ঔষধ কমিয়ে দিলেন।

সিলভির বাসায় তাঁর উনসত্তরতম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হলো। সিলভি চমৎকার রান্না করেছিলেন। একজন আরেকজনের গ্লাস ঠুকে ঠুকে মজা করে পান করলেন। সার্ত্রের এক তরুণী গ্রীক বান্ধবী নিয়ে একটু অস্বস্তিকর কান্ড ঘটলো। মেয়েটি একটু পাগলামী করছিলেন। কিছুটা অপ্রকৃতিস্থও ছিলেন। সর্বনে তিনি অধ্যাপক আলতুসের-এর ক্লাস করছিলেন। এদিকে আলতুসের স্বয়ং ডিপ্রেশানে ভুগে হাসপাতালে নীত হয়েছেন। মেয়েটির বাবা তাঁকে দেশে ফিরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করলেন। সার্ত্রের দু:খ: "তাঁকে বোধহয় আর কখনো দেখতে পাবোনা।" এদিকে সার্ত্রকে নিয়ে আর্লেৎ জুনাসে যাবেন। সিলভি ও সিমন স্পেনে ঘুরে বেড়াবেন। জুনাস থেকে প্যারিস এবং ফ্লোরেন্স থেকে টেলিগ্রামে তাঁর খবর আসছে। এদিকে সেখান থেকে ইতালী যাবার পথে জানা গেল সিলভির বাবা মারা গেছেন। সিমনকে আভিইঁনোঁ রেখে সিলভি ব্রতাইঁন চলে গেলেন। সিমন ট্রেনে গেলেন ফ্লোরেন্স। হোটেলের লবিতে বসে থাকা সার্ত্রকে চিনতে কষ্ট হলো। টুপি মাথায় সাদা ফেনায় আচ্ছাদিত মুখমন্ডল। নাপিতের কাছেও তিনি যাবেন না। ট্রেনে রোম যাবার পথে তিনি প্রায় ঘুমিয়ে কাটালেন। হোটেলের নাপিতের ওপর তাঁর ভরসা হলো। দাড়ি কাটানো হলে তাঁকে অনেক অল্পবয়স্ক মনে হলো। ক' দিন পর সিলভি ফিরে এসে তাঁকে একটা ইলেকট্রিক শেভিং মেশিন কিনে দিলেন। দেখা গেল, তিনি ঠিকভাবে তাঁর কাজ করে নিতে পারছেন।

সিলভি সিমনকে টেপ রেকর্ডার ব্যবহারের কায়দাও শিখিয়ে দিলেন। তিনি পর্যায়ক্রমে সুবিধামতো তাঁদের দুজনের কথোপকথন টেপ করে নিতে থাকলেন। এছাড়া তাঁদের দৈনন্দিন জীবন আগেকার ইতালী অবস্থানের মতোই কাটতে লাগলো । অন্য আরো কিছুর মধ্যে সিমন তাঁকে সল্‌জেনিৎসিনের *গুলাগের আর্শিপেলাগো* এবং ফেস্ত -এর *হিটলার* পড়ে শোনান। সন্ধ্যায় তাঁরা কোনো প্রিয় রেস্তোরাঁর বর্হিবারান্দায় বসে নৈশ-ভোজন সেরে নেন। এক সন্ধ্যায় হেঁটে হোটেলে ফেরার পথে একটু অন্ধকার রাস্তায় একটা গাড়ি থেকে কেউ হাত বাড়িয়ে সিমনের হ্যান্ডব্যাগ টেনে ধরলো। ধস্তাধস্তিতে তিনি পড়ে গেলেন। সার্ত্র ও সিলভি তাঁকে টেনে তুললেন । তাঁর বাঁ হাতের হাড় নড়ে গেছে, পরে প্লাস্টার করে সারাতে হল।

প্যারিসে ফিরে অনেকটা ঘরে বসে থাকা হল। সেই মধ্য-সেপ্টেম্বর বৃষ্টি-বাদলায় আবহাওয়া ছিল দুর্যোগপূর্ণ। এই সুযোগে সিমন সার্ত্রের অনেক সাক্ষাৎকার নিতে থাকলেন। এই সময়ে তিনি রাষ্ট্রপতি জিস্কার দেস্ত্যাঁ-র কাছে বেনি লেভি (পিয়ের ভিক্তর) কে খুব দ্রুত জাতীয়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিলেন। জিস্কার দ্রুত জবাব দিলেন; এবং জরুরী ভিত্তিতে কাজটি করলেন । সার্ত্র ধন্যবাদ জানালেন আরেকটি পত্রে। *লিবেরাসিওঁ* পত্রিকা বাঁচিয়ে রাখার জন্য একটি চিঠি পাঠালেন পত্রিকায়। সিমন তাঁকে পড়ে শোনালেন কয়েকটি বই যেমন, গ্রামসির রাজনৈতিক রচনা, চিলি সম্পর্কে একটি রপোর্তাজ, 'আধুনিক সময়'-এর সাম্প্রতিক সংখ্যাগুলো, 'স্যুররিয়ালিজম ও স্বপ্ন' , 'ভার্জিনিয়া উলফের জীবনী'। বেশ শক্তভাবে তিনি যেন দাঁড়িয়ে গেলেন। সিমন তাঁর সুন্দরভাবে নিজেকে বিজয়ী করে তোলায় প্রশংসা করলেন। এতে তাঁর মনে জাগে নানা প্রশ্ন।

১৬ই ডিসেম্বর সার্ত্র ইউনেস্কোর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের একটি ঘোষণায় স্বাক্ষর দিলেন। কেননা ইউনেস্কো ইসরায়েলকে কোন

এলাকাভুক্ত করতে অস্বীকৃতি জানাল। এই সময়ে ক্লাভেল তাঁকে নিয়ে টেলিভিশনে একটি সিরিজ করার প্রস্তাব দেন। ভিক্তর ও গাভির সঙ্গে আলাদা করে ঠিক হলো, তিনি এই শতাব্দীর ইতিহাস নিয়ে কিছু বলবেন। সিমনও একমত হলেন। ২১শে ডিসেম্বর তিনি একটি পত্রে জর্মন কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁকে আন্দ্রোয়াস বাদে-র সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দিতে না দেওয়ার প্রতিবাদ জানালেন। এই বিষয়টিকে তিনি অঙ্গীকারাবদ্ধ মনে করলেন। বাদের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্যাতিত হয়েছিলো। জর্মন কর্তৃপক্ষ পরে সার্ত্রকে দেখা করতে অনুমতি দেন। ৪ঠা ডিসেম্বর তিনি স্টুটগার্ট গেলেন। বাদের-এর সঙ্গে সাক্ষাতের পর প্রেস কনফারেন্স করলেন। 'বিদ্রোহ করার সঙ্গত কারণ আছে' শীর্ষক একটি বিতর্ক সভাও হল ২রা ডিসেম্বর।

১৭ ডিসেম্বর সার্ত্র প্যারিসের জাপানি হাউজে ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর দর্শন ও রাজনীতির সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করলেন। আরো কিছু বিবৃতি ও বক্তৃতা চলল। টেলিভিশনে সপ্তাহে তিনদিন ভিক্তর, গাভি ও সিমনের আলোচনার অনুষ্ঠানও চালু থাকল: প্রতিটি ৬৫ মিনিট করে ১০টি "শতাব্দীর ইতিহাস" বিষয়ক অনুষ্ঠান। ক' জন তরুণ গবেষকদেরও এজন্য নিয়োগ দান করা হল।

১৯৭৫

অনুষ্ঠানটি কী ভাবে হবে, কে কে থাকবে, পয়সা কোত্থেকে আসবে ইত্যাকার বহু বিষয় নিয়ে এনতার ঝামেলা পোহাতে হল। সার্ত্রের অভিপ্রায় একটা নান্দনিক- আদর্শবাদী কর্ম সম্পাদিত হোক। বিগত পঁচাত্তর বছরের ইতিহাসের অনেক কিছু প্রধানত সার্ত্রের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রদত্ত তথ্যাদির ওপর নির্ভর করে তৈরি হবে। ইতিমধ্যে কোঁতা ও আস্ত্রুক নির্মাণ করেছেন *সার্ত্র পার লুই- মেম* শীর্ষক ডকুমেন্টারী। *লার্ক* পত্রিকা প্রকাশ করেছেন "সিমন দ্য বোভোয়ার এ লা

ল্যুৎ দে ফাম" (সিমন ও নারীকুলের সংগ্রাম)। তাতে সিমন সার্ত্রকে নারীবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। কিছু জবাব তিনি খুব মজা করে, একটু হালকা ভাবেই দিয়েছেন।

২৩শে মার্চ থেকে ১৬ই এপ্রিল তাঁরা পর্তুগালে অবস্থান করেন। প্রায় এক বছর আগে সেখানে একটা বিপ্লব সংঘটিত হয়। ৫০ বৎসর ফ্যাসিস্ট শাসনের পর বিশেষ করে অঙ্গোলিয়া যুদ্ধের কারণে সামরিক কর্মকর্তারা বিদ্রোহ করেন। 'ক্যু দেতা' র সঙ্গে জনগণও জেগে ওঠে। সার্ত্র সাগ্রহে লিসবন দেখার প্রত্যাশায় ছিলেন। শহরের কেন্দ্রস্থলে একটা হোটেলে উঠলেন তাঁরা। সঙ্গে পিয়ের ভিক্তর ও সের্জ জুলিও ছিলেন। ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে একটা বক্তৃতা করলেন সার্ত্র। কিন্তু তাদের প্রতিক্রিয়ায় তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। অন্যদিকে শ্রমিকদের সঙ্গে তাঁর খুব ভালো সম্পর্ক স্থাপিত হলো। লেখকদের সঙ্গে একটি সভাও খুব সুবিধার হলো না।

ফিরে এসে সার্ত্র রেডিওতে একটা ভালো অনুষ্ঠান করলেন এবং *লিবেরাসিও* পত্রিকায় ২২-২৬ এপ্রিল পর পর ৫টি সাক্ষাৎকার দিলেন (সার্ত্র, ভিক্তর, গাভি ও সিমন সম্পাদনায় জুলী): ১. বিপ্লব ও সৈন্যবাহিনী ২. নারী ও ছাত্র ৩. জনগণ ও স্বয়ং সম্পূর্ণতা ৪. বৈপরীত্য ৫. ত্রয়ী শক্তি।

সার্ত্র চেক দার্শনিক কারেল কোসিক-এর চিঠির জবাবে একটি খোলা চিঠি প্রকাশ করলেন। চেক সরকার নির্যাতন ছাড়াও কোসিকের পাণ্ডুলিপিও জব্দ করে রেখেছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন দার্শনিক। এছাড়া আরো বহু বিবৃতি-প্রতিবাদলিপি, প্যারিস-ভিয়েনা চুক্তি মান্য করার আবেদন প্রকাশ করলেন।

সার্ত্রের পুরোনো বন্ধু মায়েয়-র বাড়িতে বেশ কিছু ভালো সময় অতিবাহিত করলেন। সঙ্গে ছিল সিলভি। সার্ত্রের স্বাস্থ্য বেশ ভালোই, জুনে তাঁকে খুবই প্রাণবন্ত দেখাল। ছাত্ররা আসতো, তাঁর সম্পর্কে রচিত গবেষণাগ্রন্থ ও বই পত্র নিয়ে। সংবাদ মাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে প্রচুর কথাবার্তা শোনা যেত। খুশি মনে তিনি সিমনকে বললেন: "এ কী

দেখছি, লোকে বলবে আমি যেন আবার বিখ্যাত হয়ে পড়েছি।" কোঁতার সঙ্গে তিন দিনের জন্য জুনাস গেলেন মার্চে। ওঁকে একটা লম্বা এবং মর্মস্পর্শী সাক্ষাৎকার দিলেন যা *ল্য ন্যুভেল অবসেরভাত্যর* তাঁর ৭০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ছাপল। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আর চিঠির বন্যা। সাক্ষাৎকারটিতে সার্ত্র সংক্ষেপে তাঁর জীবনকাহিনী, বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিবৃত করলেন। *(সিতুয়াসিও-১০)।*

২১শে জুন লিলিয়ান সিগেল তাঁর সম্মানে একটি উৎসবের অয়োজন করলেন। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন: ভিক্তর, গাভি, জেসমার, জর্জ মিশেল ও সিমন। সবাই ছিল খুবই উৎফুল্ল ,সার্ত্র প্রাণ খুলে হাসলেন।

সেবার গ্রীষ্মাবকাশ কাটানোর পরিকল্পনা একটু বদলে গেল। প্রথমে আর্লেৎ -এর বাড়ি, পরে ওয়দাঁর সঙ্গে রোম, সিলভিসহ সিমনের সঙ্গে এথেন্সে। সার্ত্র তাঁর গ্রীক তরুণী বান্ধবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। পাগলামী কাটিয়ে তিনি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। ঔষধ খাওয়ার ফলে ওজন বেড়ে গেছে দশ কিলো। কিন্তু আগে যেমন খুব কথা বলতেন এখন সেরকম একটু অতিমাত্রায় চুপচাপ। কিন্তু খুবই সুন্দরী এবং সার্ত্রের তাঁকে খুব পছন্দ। তাঁরা একসাথে বেরুতেন, সিমন ও সিলভি অন্য রাস্তায় ঘুরতেন। জাহাজে চড়ে গেলেন ক্রিট দ্বীপমালায়। সিমনের কাছে হোটেল এলুয়ান্দা বীচ সত্যিকার স্বর্গ বলে মনে হল। সার্ত্রও খুব উপভোগ করলেন। প্রকৃতি, পরিবেশ, খাদ্যবস্তু সবই তুলনাহীন। দশদিন পর তাঁরা ফিরে এলেন এথেন্স। ২৮শে আগস্ট সিলভি চলে গেলেন, সিমন ও সার্ত্র বিমানে চললেন রোডস দ্বীপে। সমুদ্র বেলাভূমি, পুরোন রাস্তা, কাফে সবই অতুলনীয়। রোজ রাত্রে এক-দুই ঘন্টা সার্ত্রকে বই পড়ে শোনান সিমন, এথেন্স ফিরে তাঁরা থাকলেন আরও দশদিন। গ্রীক মেয়ে মেলিনা তাঁকে সন্ধ্যায় নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। এগারোটার দিকে হোটেলে ফিরে সিমনের সঙ্গে একটু হুইস্কি সেবন (অল্পস্বল্প পানের অনুমতি ইতিপূর্বে ডাক্তার দিয়ে রেখেছিলেন)। দুটো সাক্ষাৎকারও দিলেন একটি বামপন্থী দৈনিকে, অন্যটি এক এনার্কিস্ট বুলেটিনে।

প্যারিসে ফিরে টেলিভিশনের অনুষ্টানটি নিয়ে নতুন গ্যাঞ্জামে পড়লেন তাঁরা। সার্ত্রের বিরুদ্ধেও কিছু লেখালেখি হল। তিনি নাকি আর্থিক সুবিধা নিতে চান যা সর্বৈব মিথ্যা। এমনকি ১৯৬৪ তে প্রত্যাখ্যান-করা নবেল পুরস্কারের অর্থ নাকি তিনি ফিরে পেতে চান। সার্ত্র এসবের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ-পত্র পাঠালেন সব কাগজে। লুক্সমবুর্গ রেডিও-টেলিভিশনের একটা অনুষ্ঠান হলো ৫ই অক্টোবর সিমন ও ভিক্তর সহ। কিন্তু সার্ত্রকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন সার্ত্র । নিজেকে তিনি সোজা ধরে রাখতে পারছেন না। প্রায় পড়ে যাচ্ছেন। সবাই ধরাধরি করে তাঁকে ঘরের বিছানায় শুইয়ে দেন। সিমন বিকেল বেলা তাঁর কাছেই কাটালেন। সন্ধ্যায় ডা. যাইদমান এলেন। সার্ত্রের জ্বর-মাত্রা তখন ১৪-২০। দরজা খোলা রেখে সিমন পাশের ঘরে শুয়ে থাকলেন। এভাবে দু'দিন কাটল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ডা. যাইদমানের সঙ্গে প্রফেসর জ্যপ্রেসল্‌ও এলেন। সার্ত্রের তখন জ্বর-মাত্রা ২১।

১৫ তারিখ সকালে ডা. যাইদমান এলেন । তখন ১৬ ডিগ্রীতে জ্বর নেমে এসেছিল। এক-এক দিন দুপুরে এক- এক বান্ধবী খাবার নিয়ে আসেন। রাত্রে সিমন অল্প-স্বল্প কিছু নিজে কিনে খাওয়ালেন। কিন্তু মুশকিল দেখা গেল সার্ত্র ধূমপান করবেনই। কোন কথা শুনবেন না। তিনি ঔষধ কমিয়ে দিলেন এবং সার্ত্রকে একটু বাইরে নিয়ে যাবার কথা বললেন। সার্ত্র তাই করলেন। তাঁর ভাবসাব দেখা গেল যেন সংকটপূর্বকালীন অবস্থায় ফিরে গেছেন। এদিকে তাঁকে যে ঔষধ দেয়া হচ্ছে তার ফলে আবার পেশাবের গোলমাল দেখা গেল। এক রাতে তিনি তাঁর পাজামা ভিজিয়ে ফেললেন। এ ব্যাপারে তাঁর উপেক্ষার ভাব সিমনের কাছে দু:সহ মনে হল। জোর দিয়ে যেন তিনি আবার ধূমপানের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন। সিমনও জোরে শোরে বাধা দিলেন। সিমনের কথায় না মিশেল তাঁকে একটা প্রবন্ধ পড়ে শোনালেন যাতে লেখা রয়েছে আর্থারাইটিসের রোগীর ক্ষেত্রে ধূমপানের ফলে হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করতে হতে পারে? সার্ত্র নিজেকে তখন দিনে ৪টি

সিগারেটে আবদ্ধ করলেন। অবশ্য কখনো কখনো তাঁকে শেষেরটিও ভুলে যেতে দেখা গেল।

এক রোববার আলোচনা হচ্ছিল- কারু শতবর্ষ বেঁচে থাকার কোন মানে হয়না। সার্ত্র সিমনকে বললেন, "যেভাবেই হোক আমিতো একস্ট্রার অধিক কোন কিছুতেই নেই।" গাভি ফাঁকি দিয়ে স্পেনের ওপর তাঁর একটি সাক্ষাৎকার ছাপিয়ে দিলেন। ২৮ অক্টোবর ৭৫। ফ্রাংকোর তখন শেষ অবস্থা। সার্ত্রের নামে কিছু কড়া মন্তব্য প্রকাশিত হল যা তাঁর নিজেরই পছন্দ হলো না। ওষ্ঠের দিক যেমন, তেমনি গলার ভেতরেও সার্ত্র অস্বস্তিতে ভুগছিলেন। এক কাপ চা খেতে বা একটা কমলার রস খেতে তাঁর এক ঘন্টা সময় লাগতে লাগল। হাঁটতেও অসুবিধা। বাড়ি থেকে ১০০ মিটার দুরে লিবার্টি কাফেতে যেতে তাঁর খুব কষ্ট হল। পরদিন ডা. যাইদমান তাঁকে দেখে বিস্মিত হলেন। প্র. লাপ্রেস্‌ল্ শেষ বিকেলে বললেন, না, অবস্থা তত খারাপ নয়। সিমনকে তিনি বলে গেলেন: "সার্ত্র আসলে এখন একটা ধাপ থেকে নেমে গেছেন যাতে তিনি আর কখনো উঠবেন না ।" সিমনের মন্তব্য :"এক হতচ্ছাড়া ব্যাপার এই শরীর-যা আপনাকে ছুঁড়ে ফেলে অথচ মাথাটি রয়েছে শক্ত। বুদ্ধিবৃত্তিগতভাবে সার্ত্র পুরোপুরি কাজে নেমে পড়েছেন।"

আসলে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো কাজ করে যাওয়া। সুখের কথা যে মাথা ঠিকই চলছে।" সার্ত্র বলতেন। সিমনকে আরো বললেন, "বহুকাল পর আমার মনে হচ্ছে আমি অনেক বেশি বুদ্ধিমান।" তিনি ভিক্তর -এর সঙ্গে *ক্ষমতা ও স্বাধীনতা* র ওপর কাজ করে যেতে লাগলেন। সিমন যা পড়ে শোনাতেন তাতে আগ্রহ বাড়ল। গোল্ডম্যান এফেয়ার নিয়ে কান্ডকীর্তিও তাঁর মনোযোগ এড়ায় না। *ল্যা মোঁদ*-এর জন্য সার্ত্র একটা লেখা তৈরি করলেন। কিন্তু পাঠালেন না। কারণ গোল্ডম্যানের শাস্তি ইতোমধ্যে মকুব হয়ে গিয়েছিল।

কাজে কর্মে সার্ত্র বেশ হাশিখুশি । লিলিয়ান এক সকালে তাঁকে শুধোলেন: "লোকজনের ওপর এভাবে নির্ভর করে থাকতে তোমার খারাপ লাগে না ।" তিনি হাসলেন: "না, এর একটা গ্রহণযোগ্য দিকও তো আছে। খুব আদুরে হতে পারা যায়।" "হ্যাঁ, তুমি অনুভব করছ যে অন্যরা তোমাকে ভালোবাসে।" ১০ই নভেম্বর জেন ফ্রিডম্যান গৃহীত সার্ত্রের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হলো *নিউজ উইকে*। একটি প্রশ্ন ছিল: "আপনার জীবনে কী জিনিস এখন সবচে গুরূত্বপূর্ণ ?" সার্ত্র জবাব দিলেন: "জানিনা। সব। বেঁচে থাকা । ধূমপান করা।" এই হেমন্তের সুনীল ও মৌসুমী সৌন্দর্য তাঁকে খুবই মুগ্ধ করে।

এ সময় অনেকে বিবৃতিতে স্বাক্ষরের জন্য তাঁর কাছে ধর্ণা দিত। তিনি সানন্দে সম্মত হতেন।

মাল্‌রো, মঁদেস্ ফ্রঁস্, আরাগোঁ ও ফ্রঁসোয়া জাকব–এর সঙ্গে স্পেনে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ১১ জন বিপ্লবীর পক্ষে বিবৃতিতে স্বাক্ষর করলেন। সেই বিবৃতি গ্রহণ করে ফুকো, রেজি দব্রে, ক্লোদ মোরিয়াক, ইভ মোঁতঁ মাদ্রিদে গিয়েছিলেন (২৯শে সেপ্টেম্বর,*ল্য ন্যুভেল অবসেরভাত্যর*)। ইতোমধ্যে মৃত্যুদন্ড কার্যকর হওয়াতে তিনি স্পেনের বিরুদ্ধে আরেকটি প্রতিবাদ লিপি প্রকাশ করলেন। মিতেরঁ, মঁদেস্ ফ্রঁস্ ও মাল্‌রোর সঙ্গে জাতিসংঘ কর্তৃক ইহুদিবাদ ও বর্ণবাদকে একত্র করে যে প্রস্তাব করা হয়েছে তারও প্রতিবাদ করলেন (*ল্য ন্যুভেল অবসেরভাত্যর*, ১৭ই নভেম্বর) . . .

অবশেষে তাঁর বিনোদনের একটা ব্যবস্থা হলো। আর্লেৎ তাঁর জন্য একটা টেলিভিশন ভাড়া করে নিলেন। খুব কাছে বসে সার্ত্র ছবি অনেকটা দেখতে পান। এক সোমবার সকালে সিমন তাঁকে একটা চমৎকার গ্রীক ছবি দেখাতে নিয়ে গেলেন: *কমেডিয়ানদের ভ্রমণ*। ক' জন বন্ধু মিলে তাঁদের জন্যই শোর ব্যবস্থা করে। যদ্দুর সম্ভব অন্যদের

বিরক্তি উদ্রেক না করে সিমন তাঁকে সাব–টাইটল পড়ে শোনাতে লাগলেন।

১লা ডিসেম্বর কট্টর ডানপন্থী দল জিআইএন তাঁর বিরুদ্ধে এক পত্র দিল। জিজেল হালিমি এটাকে হালকাভাবে না–নিতে বললেন। সিমনও আতংকিত হলেন। কিন্তু সার্ত্র ব্যাপারটাকে খুব গুরূত্ব দিলেন না। আনন্দের সঙ্গে বছর শেষ করলেন তিনি।

সিলভির সঙ্গে তাঁরা জেনেভায় গেলেন। ঠান্ডা ও বরফ সত্ত্বেও সার্ত্র উপভোগ করলেন খুব। পুরোনো শহরের পথে পথে হেঁটে বেড়ালেন। কপ্পো দেখলেন, লোজান সফর করলেন। ফিরে সার্ত্র ভিক্তরের সঙ্গে কাজে নেমে পড়লেন আবার। তিনি কিছু লিখলেনও। এর অনেক কিছু আঁকি বুকি। কিন্তু ভিক্তর মোটামুটি পড়তে পারলেন। সিমনকে তিনি বললেন: "যা লিখেছি তাতে *বিশ্বাস* নেই "। তিনি নিজেকে যেন *লেত্র এ ল্য নেয়ঁ* এবং *ক্রিতিক* –এর ভিত্তিতে সমালোচনা করছেন । এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি তাঁর আত্মসমালোচনার নীতিতে বিশ্বাসী।

১৯৭৬

মার্চের শুরুতে সার্ত্র সিমনকে ডিক্টেশান দিয়ে লেখালেন পাসোলিনির ওপর একটি প্রবন্ধ। রোমে তাঁর সঙ্গে সার্ত্রের দেখা হয়েছিলো এবং তিনি তাঁর কিছু ছবি পছন্দ করতেন বিশেষ করে *মেদে*–র প্রথম অংশ যাতে তিনি পবিত্রতার একটি অসাধারণ আবাহন দেখতে পান। প্রবন্ধটিতে মৃত্যু বিষয়ক চিন্তাও স্থান পেয়েছে । প্রথমে তিনি তাঁর দুষ্পাঠ্য হস্তলিপিতে কিছু মকশো করেছিলেন। পরে সিমনকে মুখস্থ বলে গেলেন। বেশ ভালো একটি প্রবন্ধ ১৪ই মার্চ *কারিয়ের দেল্লা সেরা*–তে প্রকাশিত হলো। তিন ঘন্টার কম সময়ে সেটি দাঁড় করাতে পেরে তিনি সন্তুষ্ট হলেন।

ভিক্তর ও সিমনের ধারণা, দীর্ঘদিন পর সার্ত্র এরকম সুস্থ। এটা সত্য যে, কখনো তাঁকে 'নির্বাপিত' মনে হয়। কিন্তু সেটি হলো যখন খুব

বেশি লোকের আগমন ঘটে। অথবা যাদের উপস্থিতি তাঁর বিরক্তির কারণ ঘটিয়ে থাকে। একটি প্রাণবন্ত সন্ধ্যা কাটল আলিস শোয়ার্জের-এর সঙ্গে। অতীত চর্চার চাইতে পানাহার তাঁর জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছিল। নতুন কিছুর সঙ্গে সমন্বিত হওয়া শক্ত হয়ে উঠছিল। প্রতিবাদ সহ্য করতেও পারছেন না সার্ত্র। তাই অতীতের বিষয় নিয়ে ভুল করলেও সিমন মুখের ওপর কথা বলা প্রায় বন্ধই করে ফেলেছিলেন।

২০শে মার্চ সিলভিসহ তাঁরা ভেনিসে গেলেন। পায়ে হেঁটে অনেক দীর্ঘ প্রমনাদ করতে গিয়ে সার্ত্র বললেন, "একটা ছোট্ট সঙ্গী এমন ধীরে হাঁটছে দেখে আপনার বিরক্তি হচ্ছে না?" সিমন বিশ্বস্ত ভাবেই বললেন, না, তিনি যে হাঁটছেন এতই তিনি সুখী। তিনি হতাশ কণ্ঠে আবার বলে উঠলেন: "আমার চোখ কি আমি আর কখনো ফিরে পাব না?" একসময়ে নৌকায় চড়ে গন্তব্যে পৌঁছে নামার সময়ে একজন যাত্রী তাঁকে ধরে নামাতে গেলে তিনি সিলভিকে বললেন, "আমাকে কি সত্যি অথর্ব মনে হয়?" "দেখেই মনে হয়, আপনি ভালো দেখতে পারছেন না । এতে লজ্জার কিছুই নেই।" সিমন নিজেই ডান হাতের পেশীতে অস্বস্তি অনুভব করলে বলে উঠেন, "এ আর কি, এটা বুড়োদের ভীমরতি! সবসময় বিরক্তিকর একটা না একটা লেগেই আছে!" "কিন্তু আমার কিছুই হয়নি।" অবিচলভাবে তিনি বললেন। সিমন হাসলেন। সার্ত্রও যেন বুদ্ধি বিবেচনার পর আসল সত্য বুঝতে পেরে হেসে উঠলেন।

প্যারিসে ফিরে ভিক্তরের সঙ্গে কাজে লেগে গেলেন সার্ত্র। সুন্দর বসন্ত । রোদ, সবুজ বাগানে ফুল পাখির গান, পড়াশুনা, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র তাঁদের বিকেল ও সন্ধ্যাকে ভর্তি করে রেখেছিল। বছরের শুরুতে *সিতুয়াসিওঁ*- ১০ বেরিয়ে গেছে যাতে রয়েছে ৪টি রাজনৈতিক প্রবন্ধ- ফ্লোবের সংক্রান্ত, একটি সাক্ষাৎকার, নারীবাদ নিয়ে সিমনের সঙ্গে একটি আলোচনা এবং কোঁতার সঙ্গে "৭০বছরের

আত্মপ্রতিকৃতি" শীর্ষক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি। এসময় গালিমার তাঁর "হওয়া না -হওয়া" শীর্ষক দর্শন গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ এবং *সিতুয়াসিওঁ*-১ পেপার ব্যাক (ইদে) সংস্করণ প্রকাশ করলেন। *লা ক্রিতিক দ্য লা রেজোঁ দিয়ালেকতিক্* গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ বের হল লন্ডন থেকে (জর্মন সংস্করণ ১৯৬৭ সালেই বেরিয়েছিল)। অস্ট্রেলীয় রেডিওকে প্রদত্ত মার্কসিজম, বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ে সাক্ষাৎকার ন্যুইয়র্ক থেকে পুস্তককারে প্রকাশিত হল । এছাড়া সাক্ষাৎকার ও রচনা বের হলো কয়েকটি। আর বিবৃতি স্বাক্ষর তো আছেই একাধিক। *ল মোঁদ* ১৮ই ফেব্রুয়ারি প্রকাশ করল একটি বিবৃতি যাতে সার্ত্র ও সিমনসহ পঞ্চাশ জন নবেল বিজয়ী ডঃ মিখায়েল স্টার্ন-এর মুক্তির জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

এবারের গ্রীষ্মে একমাসের পৃথকবাস - সার্ত্র গেলেন জুনাস, আর্লেৎ এর সঙ্গে, পরে ভেনিস যাবেন ওয়ঁদার সঙ্গে। এদিকে সিমন ও সিলভি চলেছেন স্পেনে। পরে শেষোক্ত তিনজন কাটালেন কাপ্রিতে। সার্ত্র সমুদ্রতীর উপভোগ করলেন পর্যাপ্তভাবে।

তিনজন রোমে এলেন। সিলভি চলে গেলে সিমন ও সার্ত্র আরো দু সপ্তাহ রোমে কাটালেন আগের মতোই আনন্দে। দেখা হলো সংস্কৃতি জগতের কিছু ব্যক্তিত্বের সাথে। চলল পানাহার, দুপুরে ও সন্ধ্যায়। এরপর বিমানে গেলেন গ্রীস। সার্ত্র মেলিনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁকে দেখতে যাবেন বলে। একসপ্তাহ কাটালেন সেখানে। সিমনের তখন একটা কাজ পড়ল: তাঁর *লা দাম রপ্যুঁ* টেলি-নাটকে রূপদান ও কিছু নতুন সংলাপ সংযোজন।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি প্যারিসে প্রত্যাবর্তন এবং আগের মতোই কাজে-কর্মে আত্মনিয়োগ। চমৎকার আবহাওয়া, সার্ত্রের স্বাস্থ্যও খুব ভালো। তিনি 'আধুনিক সময়ে' র বৈঠকে যোগদান বন্ধ করলেন। লেখালেখি এবং কিছু রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সময় কাটাতে লাগলেন। হেনরিক বোল-এর সঙ্গে একটি বিবৃতি স্বাক্ষর করলেন।

এদিকে সেপ্টেম্বরেই সার্ত্রের *লে ম্যাঁ সাল্* (নোংরা হাত) নাটকের পুনরাভিনয় হচ্ছিল। ১৫০তম রজনী অতিবাহিত হওয়ার পরও নাটকটি চালু থাকল মফ:স্বলে। *সার্ত্র পার লুই-মেম* শীর্ষক ছবিও প্রদর্শিত হলো অক্টোবর শেষে। *ম্যাগাজিন লিতেরের* এবং *পলিতিক এবদো* তাঁর ওপর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করলো।

সিমন তাঁকে বললেন: "কী সুন্দর *কাম-ব্যাক*।" সার্ত্র হেসে জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, শেষ শয্যার কাম-ব্যাক আরকি!" সার্ত্র অনেক গর্বিত চিত্তের মানুষ কিন্তু অকারণ অহংকারের বলী তিনি হন না। সব লেখকের মতো তিনিও তাঁর রচনার সাফল্য নিয়ে চিন্তিত। কিন্তু তাঁর জন্য অতীত খুব দ্রুত দূরাতীত হয়ে গেছে। ভবিষ্যতের লক্ষ্যে পরবর্তী বই বা নাটক নিয়ে তাঁর মানসিকভাবে ব্যস্ত থাকার কথা। কিন্তু এখন ভবিষ্যত নিয়ে বেশি কিছু ভাবনার নেই। যা করেছেন তাতে তিনি সন্তুষ্ট। তবে তিনি বিস্মৃত হয়ে এক কোনে ধরাশায়ী হয়ে থাকুন, তাও তাঁর পছন্দের নয়।

৭ই নভেম্বর ইসরায়েলী দূতাবাস থেকে তিনি জেরুজালেম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত সম্মাননা *দক্তর অনরিস কোজা* গ্রহণ করলেন। অতি যত্ন সহকারে ও মুখস্ত করা ভাষণে সার্ত্র ঘোষণা দিলেন যে, তিনি এই উপাধিটি গ্রহণ করলেন এই ভেবে যে ইসরায়েল- ফিলিস্তিনী সংলাপ চলবে: "আমি বহুদিন ধরে ইসরায়েলের বন্ধু। আমি ফিলিস্তিনী জনগণের বিষয় নিয়েও ব্যস্ত থাকি। তাঁরা অনেক সহ্য করেছেন।" একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বললেন, এখন লিখতে গেলে তিনি তাঁর *রেফ্লেকসিওঁ স্যার লা কেস্তিওঁ জুইভ* (ইহুদি প্রশ্নের ওপর চিন্তাভাবনা) নতুন করে লিখবেন। তিনি ১৯৬৭ সালে মিশর ও ইসরায়েল ভ্রমণের কথা উল্লেখ করে বলেন, "কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উপাধি দেয়া হলে তিনি তাও গ্রহণ করবেন।" নভেম্বরে *নিউ লেফ্ট রিভিউ* তাঁর *ক্রিতিক দ্য লা রেজোঁ দিয়ালেকতিক* এর দ্বিতীয় খন্ডের একটা বড় অংশ প্রকাশ করল। "একটি দেশে সমাজতন্ত্র" এই ধারণা থেকে সার্ত্র সোভিয়েৎ সমাজ

সম্পর্কে চিন্তার গভীর প্রকাশ ঘটিয়েছেন, এতে ইতিহাসের চেয়ে বেশি দার্শনিক অভিব্যক্তির পরিচয় বিধৃত। প্রথম খন্ডেই বিস্তারিত ছিল। দ্বিতীয় খন্ডের জন্য প্রস্তাবিত থাকল প্রত্যক্ষ ইতিহাস।

মেলিনা এক সপ্তাহের জন্য প্যারিসে এলেন। সার্ত্রের সঙ্গে বেশ সময় কাটালেন। কিন্তু এথেন্সের মতো এখানে তাকে পেয়ে সার্ত্র অত খুশি হতে পারলেন না। ইদানীং তিনি তাঁকে শূন্য মনে করছেন, যদিও তাঁর প্রতি সবসময় রয়েছে স্নেহার্দ্র মনোভাব। 'আধুনিক সময়' নিয়ে সমস্যা। পরিচালনা সংসদে কাজের লোকের অভাব। কিছু নতুন সদস্য সংগ্রহ করা হল। সার্ত্রের সম্মতি থাকল তাতে।

১৯৭৭

মোটামুটিভাবে তিনি বেশ ভালোই আছেন। স্বাস্থ্যগত কোন দুর্ঘটনা দেখা দেয়নি। হাঁটতে একটু অসুবিধা তো ছিলই । ধূমপান জোরে শোরে চলছে। সুতরাং সেদিকের উন্নতির আশা নেই, কিছু লিখতে ব্যথা পাচ্ছেন। কিন্তু তিনি বেশ খোশ মেজাজেই আছেন। "এখন আমি খুবই তৃপ্ত"- সিমনকে বললেন সার্ত্র। তাঁর সম্পর্কে যেসব প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হচ্ছিল তা তাঁকে খুবই আনন্দ দিচ্ছিল। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ছিল যথাযথ। যদি তিনি পড়তে পারতেন, নিজের লেখা পুনর্পাঠ সম্ভব হতো তাহলে তিনি নতুন আইডিয়ার বিকাশ ঘটাতে পারতেন। তখন তিনি ভিক্তুর-এর সঙ্গে কাজ করছিলেন একটা সংলাপ নিয়ে, তাঁদের দুজনের সহযোগিতার কারণ ও তাৎপর্য নিয়ে। ৬ই জানুয়ারি *লিবেরাসিওঁ*-তে তা প্রকাশিত হলো।

ক্ষমতা ও স্বাধীনতা শীর্ষক তাঁর যে বই করবার কথা তা যে এগুচ্ছে না সেটা শুধু শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে নয়। তাঁর ধারণা এতে তাঁদের সবাই কে অংশগ্রহণ করতে হবে । "সেটি হবে আমার জীবনের শেষের কালে আমার যে নীতিবোধ ও রাজনৈতিক দিগদর্শন- সেটাই আমি দিয়ে যেতে চাই, তাই" তিনি ইতস্তত; করছিলেন একটা সম্মিলিত চিন্তাশক্তির মুখোমুখি হতে। কেননা তাঁর ধারণা, চিন্তা করতে হয় একাই

। কিন্তু তাঁর প্রত্যাশা: *আমরা* একটা চিন্তাশক্তি নিয়ে এগিয়ে আসতে পারব... । দৃশ্যত, পরিস্থিতির দ্ব্যর্থকতা সার্ত্রকে বিব্রত করে তুলছিল। অবশ্য তিনি এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছিলেন। কেননা তিনি নিজেকে বোঝাতে পেরেছিলেন যে, এর কিছু ইতিবাচক দিক আছে।

ক্রমে হাঁটতে তিনি অসমর্থ হয়ে পড়ছিলেন। বাঁ পায়ে ব্যথা । ডাক্তার কিছুটা আশ্বস্ত করছিলেন। সিমন ও আর্লেৎ রাতে তাঁর বাড়িতে থাকলেন। কিন্তু শনিবার তিনি ওয়ঁদার সঙ্গে রাত এগারোটা অবধি কাটালেন। পরে এক রোববার সিমন ও সিলভির সঙ্গে লা পালেৎ রেস্তোরাঁয় মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় তাঁকে অদ্ভুত লাগলো: পুরো ঘুমিয়ে পড়েছেন। ৯টার দিকে তাঁর অবস্থা খারাপ দেখে সিমন একজন এস ও এস ডাক্তার ডাকলেন। একটা ইনজেকশান দেয়াতে জ্বর-মাত্রা ২৫থেকে ১৪তে নেমে এল। পরদিন তাঁকে ভয়ানক ক্লান্ত দেখাল। ডা. কুর্নো এসে লিলিয়ানকে জিগ্যেস করলেন, সার্ত্র পান করছিলেন কিনা । লিলিয়ান স্বীকার করলেন, আগের রাত্রে ওয়ঁদার বদলে মিশেলের সঙ্গে তিনি আধা-বোতল হুইস্কি পান করেছিলেন।

জানুয়ারির শুরুতে উৎসবের মধ্যাহ্ন-ভোজ হয়েছিল। *সার্ত্র পার ল্যুই-মেম* ছবির টেক্সটটি বেরিয়েছিল গালিমার থেকে। বিরাট সাফল্য! কাথরিন শেইন এর কাছে সার্ত্র তাঁর সঙ্গে মহিলাদের সম্পর্ক বিষয়ে একটি সাক্ষাৎকার দিলেন যা *ল্যা নুভেল অবসেরভাত্যর*- এ প্রকাশিত হলো ৩১শে জানুয়ারি। তিনি 'আধুনিক সময়ের' বৈঠকে থাকতে লাগলেন যা এখন থেকে তাঁর বাড়িতে মাসে দুই বুধবার সকালে অনুষ্ঠিত হতে লাগল। ১৩ই ফেব্রুয়ারি *ল মোঁদ* পত্রিকায় তাঁর নামে প্রকাশিত হলো এক নিবন্ধ যা আসলে তাঁর সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে লিখেছিলেন ভিজিয়ে। তাতে বক্তব্য হল: জর্মনীর সোশাল ডেমোক্রেটিক (দল) ১৯৪৫ সালে পুর্নগঠিত হবার সময় থেকে ইউরোপে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একটি সুবিধাভোগী হাতিয়ারে পরিণত । তাঁর দাবী

সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামীরা যেন এই জার্মানো-আমেরিকান আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ে যায় । লঁজমান, পুইয়োঁ, ভিক্তর ও অন্যান্যরা সার্ত্রকে তাঁদের অসমর্থন গোপন করলেন না।

মেলিনাকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এথেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে বক্তৃতা করবেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারি বিমানে পিয়ের ভিক্তরকে নিয়ে গেলেন সেখানে। এক সপ্তাহে থাকলেন। দুপুরে ভিক্তর এর সঙ্গে খাওয়া দাওয়া, রাত্রে মেলিনার সঙ্গে ডিনার। বক্তৃতা তাঁর মাথায়। মঙ্গলবার ২২শে ফেব্রুয়ারি তিনি তা করলেন "দর্শন কী" এই বিষয়ে। পনের শ দর্শক-শ্রোতা । আসন আটশ। তাঁর এক ঘন্টা বক্তৃতা শুনে খুব হাত তালি পড়লো । ভিক্তর মনে করলো বক্তৃতা একটু 'সহজ' কিন্তু বেশির ভাগ উপস্থিত শ্রোতা যেহেতু ফরাশি খুব ভালো বোঝেন না, সুতরাং সার্ত্রের মতে কঠিন কিছুতে যাওয়া অনুচিত। পরদিন সিমন তাঁকে বিমান বন্দরে আনতে গেলে অবাক হয়ে দেখলেন, সার্ত্র খুব হাশিখুশি এবং তিনি ধূমপান বন্ধ করেছেন। এটা ছিল নিশ্চিত বন্ধ করা কারণ এরপর সার্ত্র আর ধূমপান করেননি , অন্যরা তাঁর সামনে করলে বরং উৎসাহ দিয়েছেন। বিষুদবার লিলিয়ান ও সিমন তাঁকে প্রফেসর উস্‌সের কাছে নিয়ে গেলে তিনি এক সিরিজ ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশান দেবার কথা বললেন । আপাতত সার্ত্র যেন হাঁটাচলা বাদ রাখেন। তা না হলে তাঁর হার্টে, ব্রেইনে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। সার্ত্র ডাক্তারকে দেবার জন্য সিমনের হাতে একটা মোটা খাম দিলেন।

প্রফেসর উস্‌সে লিলিয়ানের হাতে একটা রিপোর্ট দিয়েছিলেন পরে তাঁরা জানতে পারলেন যে, সার্ত্রের নিম্নাঙ্গে ৩০% রক্ত চলাচল রয়েছে । সাবধানতার সঙ্গে চললে, আরো ক' বছর বাঁচতে পারবেন। ক' বছর কথাটা সিমনের কাছে একটি ট্র্যাজিক অর্থ নিয়ে এল। তিনি ভালোই জানতেন যে সার্ত্র বেশিদিন বাঁচবেন না। কিন্তু তাঁর শেষ হবার সঙ্গে আলাদা হওয়াটা এমন যে, তাঁর পক্ষে এটা দীর্ঘসূত্রী মনে হল অতিদ্রুত

সেটাকে কাছের মনে হল। পাঁচ বছর? সাত বছর? সেভাবেই হোক একটি সময় নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট, মৃত্যু ইতোমধ্যে এসে হাজির ,সার্ত্র তার কব্জায়। সার্ত্র তাঁর দুর্ভাবনা ছাড়িয়ে এক মারাত্মক হতাশার মধ্যে অনুপ্রবেশ করলেন।

তবে তিনি পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন ঠিক করলেন। সার্ত্রকে দশ পনের দিন খুব অল্প হাঁটতে বললেন। তাঁদের ভেনিসে যাওয়া ঠিক ছিল। সার্ত্রের জন্য চলন্ত চেয়ারের ব্যবস্থা হল।

ভেনিসে অন্য বছরের মতো একই হোটেল কক্ষে স্থান নেন। সার্ত্র খুব উৎফুল্ল। কিন্তু তাঁর প্রিয় রেস্তোরাঁয় খেতে যাওয়া, এমনকি স্যাঁ মার্ক স্কোয়ারে যাওয়াও তাঁর জন্য কঠিন হয়ে পড়ল। বিকেলে একটু ঘুমুলে আর সঙ্গীত শ্রবণে ব্যস্ত থাকলে সিমন সিলভিকে নিয়ে বেড়িয়েছেন। সার্ত্র সেখান থেকে ফেরার পথে বলছেন যে, তিনি এই সফরে খুব সন্তুষ্ট।

ফিরে ক' দিন তিনি খুব মেলিনাকে দেখলেন। এখন আবার তাঁকে পেয়ে খুশি: "ওঁর সঙ্গে থাকলে আমার মনে হয় আমার বয়স পঁয়ত্রিশ" সিমনকে বললেন সার্ত্র। লিলিয়ানও স্বীকার করলেন কথাটা। খুব ভালো। আগ্রহের বিষয়তো তাঁর জীবনে খুব কম জিনিসেই আছে এখন। আবার পায়ে ব্যথা। এক সকালে ঘুম থেকে জেগে তিনি বললেন, তাঁর মনে হচ্ছে কেউ যেন তাঁর ডান পা'টা কেটে ফেলছে। এসপিরিন একটু ব্যথা কমাল। নতুন ইনজেকশান একেবারে থামিয়ে দিল। তবু হাঁটতে খুব অসুবিধা ।

সিমনের সঙ্গে তিনি খোলামেলা, জীবন্ত। অন্যদের সামনে চুপচাপ, মুখ বন্ধ। এমনকি একদিন বোস্ত- এর সামনে মুখ খুললেন না। অবাক কান্ড। সিমন ভাবছেন, ঠিক এটাই তো আসবে। তিনি তো সব সময় নিজেকে এমনভাবে পরিচালিত করেছেন যাতে পূর্ণভাবে সময়ের ব্যবহার করেছেন। ক্লান্তির বিরুদ্ধে কোন মৃত সময় নেই।

সিমন যখন খুশি ছুটি কাটাতে যেতে পারেন। তাতে জীবন অর্থহীন হয়ে পড়েনা। কিন্তু সার্ত্রের তা নয়। তিনি ভালোবাসেন বাঁচতে। এবং ভালোভাবে কিন্তু কাজ করতে পারার শর্তে।এই কাহিনীতে দেখা যাবে কাজ ছিল তাঁর কাছে... যা হাতে নিয়েছেন তা সুন্দরভাবে শেষ করতে অসুবিধার ক্ষেত্রে তিনি যেন ঠিক ভাবে ... ওপর নির্ভরশীল। তিনি এত বেশি দিকে তাঁর কার্যক্রম ছড়িয়ে দিয়েছেন যে তাঁর শক্তির বাইরে একে একটা অবশ্যম্ভাবী সংকটে পতিত হয়েছেন। যেটা তিনি পূর্বাহ্নে আঁচ করতে পারছিলেন না এবং যা তাঁর জন্য ভয়ংকর, সেটা হল তাঁর প্রায়ান্ধ অবস্থা। কিন্তু তিনি একটা বিশ্রাম কামনা করছেন এবং অসুস্থতা তাঁর জন্য একটা কারণ হয়ে দাঁড়াল ।

আজ সিমন এই হাইপোথেসিসে বিশ্বাস করেন না - যা একঅর্থে বেশি আশাবাদী - তাতে। কেননা তা হবে সার্ত্রকে তাঁর নিয়তির স্রষ্টা দাবী করার মতো। যা নিশ্চিত তা হলো, তাঁর শেষ বছরগুলো হচ্ছে তাঁর গোটা জীবনের প্রতিক্রিয়া । তাঁর এক্ষেত্রে রিল্‌কের কথা খাটে: "প্রত্যেকে নিজের মধ্যে মৃত্যুকে বহন করে, তার বীজের ফল স্বরূপ।" সার্ত্র তাঁর জীবনের ক্ষেত্রে অবশ্য মৃত্যুকেও পেয়ে গেলেন। সে জন্যই বোধ হয় তিনি তা এত শান্তভাবে গ্রহণ করছেন । সিমনের কোন মোহ নেই-এই প্রশান্তিরও অন্ধকার দিক আছে। তিনি প্রায় ঘন ঘন এক গ্লাস এলকোহল চান। ছুটির পর সিমন ভিক্তরকে জিগ্যেস করেন তাঁকে কী রকম লাগছে, তাঁর কাছ থেকে "আরো খারাপ" জবাব এল। প্রতিটি সাক্ষাৎকারের পর তিনি রেগে-মেগে হুইস্কি খেতে চান। অবশ্য ২১শে জুন তাঁর বাহাত্তরতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁকে খুব হাসিখুশি দেখাল। বেশ ক' জন বুদ্ধিজীবীসহ তিনি রেকামিয়ে থিয়েটারে পূর্ব ইউরোপের ভিন্নমতাবলম্বীদের জন্য আয়োজিত এক অভ্যর্থনা সভায় যোগ দেন । একই সময় প্রেসিডেন্ট জিস্কার দেস্ত্যাঁর ব্রেজনেভকে এলিজে প্রাসাদে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। সার্ত্র ড. মিখায়েল স্টার্নের পাশে

বসেছেন। সিমনসহ তিনি তাঁর মুক্তির ব্যাপারে ভূমিকা পালন করেছেন। স্টার্ন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন সেজন্যে।

সে বছরও অন্যান্য সময়ের মতো তিনি বহু প্রতিবাদ-পত্র বিক্ষোভ-লিপি স্বাক্ষর করেন। বিশ্বের বিভিন্ন অংশে এইসব অন্যায় কর্ম সংঘটিত হচ্ছিল। ২৮ শে জুলাই সংগীত বিশেষজ্ঞ লুসিয়াঁ মালসোঁকে তিনি এক সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।। তাঁর সঙ্গীত-রুচি সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেন সার্ত্র।

পূর্বের অভ্যাস মতো ওয়ঁদার সঙ্গে তিনি ভেনিসে যান এবং পনের দিন কাটান। সিমন ফিরে তাঁর খোঁজ খবর নেন । পরে তিনি সিলভির সঙ্গে অস্ট্রিয়া যান। সেখানকার প্রকৃতি ও যাদুঘর প্রভৃতি দর্শন তাঁর বিপর্যস্ত-মানসিকতা কাটাতে সহায়ক হলো। পরে তিনি নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। সুস্থ হয়ে তাঁরা দু জন ভেনিসে চলে আসেন। সেখান থেকে সার্ত্রকে নিয়ে গেলেন ফ্লোরেন্স । পরদিন দুটোর দিকে এলেন রোমে। তাঁদের পুরোন হোটেলে ঝুল বারান্দাসহ কক্ষ পাওয়া গেলো না। কিন্তু ভালো একটা সুইট পেলেন ষষ্ঠ তলায়। সামনে স্যাঁ পিয়ের এবং সূর্যাস্ত দেখার সুযোগসহ সার্ত্র চমৎকার অবস্থায় আছেন। শুধু হাঁটা চলার কথা বাদ দিলে। পঁয়ত্রিশ দিন কাটালেন-প্রথম ক' দিন সিলভিসহ, পরে শুধু তাঁরা দু জন । সেসব বই সিমন তাঁকে পড়ে শোনাতেন । তা নিয়ে সাগ্রহে আলোচনাও করতেন। শোনানো হত বেশি ভিন্নমতাবলম্বী রুশ লেখকদের রচনা । এরমধ্যে ইতালীয় এক ঘটনার সঙ্গে জড়িত হয়ে সার্ত্র ১৫ সেপ্টেম্বর এক বড়সড় সাক্ষাৎকার প্রকাশ করলেন। সেটি হলো কম্যুনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়ে। লেখাটি সবাইকে খুশি করলো। সার্ত্র খুব সুন্দর বললেন। সিমনের সঙ্গে তাঁর আলোচনা চলল। সিমনের মন্তব্য : "তিনি বুড়িয়েছেন নি:সন্দেহে, কিন্তু তিনি ছিলেন সত্যিকার ভাবে সার্ত্র।" তাঁর মনে কিছু দুষ্টুমিও ছিল।তিনি চাচ্ছিলেন না যে, মেলিনা তাঁকে দেখতে রোমে

আসুক কিংবা তাঁরা এথেন্সে যান। বরং তিনি মেলিনাকে কিছু অর্থ দেবেন যাতে ও এবছরটি প্যারিসে কাটাতে পারে। কিন্তু তিনি দেখা করবেন না। প্যারিসে ফিরে যাবার অল্প পরে মেলিনা এসে হাজির । সার্ত্র তাঁকে বললেন: "তোমার জন্য আমার অনেক স্নেহ। কিন্তু আমি তোমাকে তো আর ভালোবাসিনা ।" মেলিনা একটু কাঁদলেন। সার্ত্র কখনো কখনো তাঁর সঙ্গে দেখাও করলেন।

সার্ত্রের চারপাশে তখন অনেক নারী: তাঁর পুরনো বান্ধবী, নবাগতা। সিমনকে আনন্দিত কণ্ঠে তিনি বললেন: "এতো নারী কখনো আমার চারপাশে ছিল না তো।" তবে তিনি অসুখী ছিলেন না। তাঁর দু:খ যে, তিনি তাদের চেহারা দেখতে পাচ্ছেন না। অন্যান্য কর্মকান্ড বেশ জোরে শোরে চলছিল। নভেম্বরের শেষ দিকে সিমনকে তিনি ছোট্ট ভূমিকার জন্য শ্রুতলিপি দিলেন : সেটি ছিল তাঁর নাট্যগ্রন্থ সমূহের মার্কিন সংস্করণের জন্য।

এ সময় তাঁর *নেক্রাসভ* নাটকটি অভিনীত হবার কথা হল অক্টোবরে । ১৯৫৫-র পর এটি আর মঞ্চস্থ হয় নি। ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে শেষবারের মতো আবার অভিনীত হলো। সার্ত্র স্বয়ং উপস্থিত হয়ে দৃশ্যনাটক ও অভিনয়... । পরিচালক ও অভিনেতাদের তিনি উষ্ণভাবে অভিনন্দিত করলেন।

১৯৬৭ সালে মিশর ও ইসরায়েল ভ্রমণের পর থেকে তিনি বিশেষভাবে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট সাদাৎ ইসরায়েল পরিদর্শনে যাচ্ছেন এতে তিনি খুব অনুপ্রাণিত বোধ করলেন। এমনকি একটি ছোট্ট কিন্তু চমক লাগানো রচনা লিখলেন যা *ল্য মোঁদ* ছাপল (৪-৫ ডিসেম্বর)। এতে তিনি এই দুটি দেশের সুসম্পর্কের বিষয়ে উৎসাহিত করলেন।

খুব আনন্দের সঙ্গে বছর শেষ করলেন সার্ত্র । সিমন ও সিলভি সহ দমিনিক রেস্তোরাঁয় ডিনারে টার্কি খেলেন। বছরের কাজে ও জীবনযাপনে তিনি সন্তুষ্ট।

১৯৭৮

মেলিনাসহ অনেক অল্পবয়সী মেয়ে তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করছে। একদিন ভিক্তরের সঙ্গে কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছিল বলে অভিযোগ করছিলেন। সিমন হেসে বললেন : "অনেক বেশি তরুণী!" "কিন্তু ওদের যে আমার বেশি প্রয়োজন"- সার্ত্র তাঁকে বললেন। সিমন ভাবলেন, বেঁচে থাকার রশদ রূপে এখন তাঁর এদের সান্নিধ্য দরকার। সার্ত্রও তাঁকে সরলভাবে জানালেন, "মেয়েদের আগে কখনোও এতো ভালো লাগে নি।" সার্ত্রের মনে কিছু আশাবাদ সঞ্চারের মতো ঘটনা ঘটলো। লিলিয়ান সিগেল তাঁর অনেক ছবি নিয়ে একটা এ্যালবাম তৈরী করলেন। সিমনের মন্তব্যসহ প্রকাশিত হলো গালিমারের ঘর থেকে। সেখান থেকে তাঁর উপন্যাস সমগ্রের বিশেষ অভিজাত সংস্করণ লা *প্লেইয়াদ*ও বেরুলো। এই সময়ে *অবলিক* সাময়িকী তাঁর ওপর একটা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করল। বহু তরুণ লেখক বুদ্ধিজীবীদের তাঁর রচনা সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ সার্ত্রকে আরো উদ্দীপিত করে তুলল।

তবে তাঁর একটা বড় দুশ্চিন্তার কারণ দেখা গেল: অর্থ। সিমন দীর্ঘদিন থেকে জানেন এটা। তিনি দেখেছেন, সার্ত্র কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না এবং যে যখন যা চায় তা তাকে দিয়ে দেন। এভাবে কেটেছে সারাটি জীবন। বর্তমানে প্রতিমাসে নিয়মিত বরাদ্দকৃত অর্থ বিভিন্ন ব্যক্তিকে দেয়া হচ্ছে। গালিমারের কাছ থেকে তিনি যে পেনশন (তথা রয়ালটি বাবদ অগ্রিম) পান তাতে প্রয়োজন মিটে যাওয়ার কথা । কিন্তু তাঁর নিজের খরচের জন্য আর কিছুই থাকে না। সিমন তাঁকে একজোড়া জুতো কিনতে বললে তিনি বলেন: "আমার কিচ্ছু নাই তো!" তাঁকে কিনে দিতে চাইলেও নেবেন না। প্রকাশকের কাছে তাঁর বড় ধরনের ঋণ হয়ে গেছে বলে সিমনের ধারণা। এই পরিস্থিতি তাঁকে খুব শঙ্কিত করলো, তাঁর নিজের জন্য নয়। বরং যারা তাঁর ওপর নির্ভরশীল তাদের জন্য।

সাদাতের সফর কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো তা দেখার জন্য ফেব্রুয়ারিতে তিনি জেরুজালেম গেলেন। সঙ্গে ভিক্তর ও আর্লেৎ। সিমনের আশংকা: সংক্ষিপ্ত হলেও এই সফর সার্ত্রকে না বেশি হয়রান করে ফেলে। এলি বেন্ গাল তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়ে নিজের গাড়িতে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। পুরনো শহরে তাঁর আরামদায়ক অবস্থান। একটি রাত তাঁরা মৃত সমুদ্রের পাড়ে এক চমৎকার হোটেলে কাটালেন। পাঁচদিন সার্ত্র ও ভিক্তর ইসরায়েলী ও ফিলিস্তিনীদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে গেলেন। চমৎকার আবহাওয়া, সুনীল আকাশ। সার্ত্র খুব পছন্দ করলেন। তিনি নড়াচড়া করতে, খোঁজখবর নিতে, দেখতে যতটুকু তাঁর দৃষ্টি তাঁকে দেখতে দেয়, ভালোবাসতেন । অনেকে বলেন, বার্ধক্যের কারণে মানুষ কৌতূহল হারিয়ে ফেলে। তাহলে বলতে হবে যে, সার্ত্র বুড়িয়ে যাননি। এটা সিমনের মন্তব্য।

এত সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধানের পর সার্ত্র নিজে কখনো একটা রপোর্টাজ লিখতেন না। কিন্তু ভিক্তরের তাগিদে দুজনের স্বাক্ষরে *ল্য ন্যুভেল অবসেরভাত্যরে* একটি লেখা তিনি পাঠিয়ে দিলেন (আরব-ইসরায়েল সম্পর্কের ওপর)। সার্ত্র প্রথম দিকে সাক্ষাতের পর ভিক্তরকে বলেছিলেন, "তোমরা মাওবাদীরা সবসময় একটু জোরে চলো।" ছাপা হবার আগেই লেখাটি পড়ে ঢি ঢি পড়ে গেল। বোস্ত সিমনকে ফোন করে বললেন : "ভীষণ খারাপ; পত্রিকা অফিসে আমরা সবাই দুর্ভাবনাগ্রস্থ। সার্ত্রকে এটা ফিরিয়ে নিতে বলুন।" সব শুনে সার্ত্র বললেন, "ঠিক আছে।" সিমন ভিক্তরকে একথা জানালে তিনি ক্রোধান্বিত হলেন। তাঁকে আগে না জানানোর জন্য সিমনকে অভিযুক্ত করলেন। সিমনের ধারণা, সার্ত্র তাঁকে বলেছেন। কিন্তু ইদানীং তিনি এসব ব্যাপারে গা করেন না। তিনি কিছু বলেন নি। এরপর সিমনের বাড়িতে 'আধুনিক সময়ের' বৈঠক হলে ভিক্তরের সঙ্গে অন্য সদস্যদের ভয়ানক কথা কাটাকাটি হল। সবাই লেখাটা অত্যন্ত বাজে মনে

করেছেন। আর ভিক্তরের ধারণা, এঁরা সব মরা মানুষ। সিমন বিষয়টিতে আহত বোধ করলেন। সার্ত্রের সঙ্গে তাঁর বহু মতানৈক্য ঘটেছে কিন্তু কখনো এরকম পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়নি। সর্বহারা বাম পরিচালনা করতে গিয়ে ভিক্তর আসলে এক পাতি নেতার মানসিকতা অর্জন করেছেন । তাঁর সঙ্গে একটা দূরত্ব স্থাপিত হলো । সিমন তাঁকে এড়িয়ে চলতে শুরু করলেন। অথচ সার্ত্রের যে বন্ধুরা আসেন তাঁরা তাঁরও বন্ধু । ভিক্তরই শুধু ব্যতিক্রম। সার্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন । তাঁর কাছে ভিক্তর বুদ্ধিজীবী ও সংগ্রামীরূপে তাঁর ইচ্ছা পূরণে সমর্থ । সার্ত্র নিজে যেমন সব চান, স্বভাবতই কেউ সব পেতে পারেনা, কিন্তু সব চাইতে হয়। বাহ্যত সার্ত্র যে ভুল করছিলেন, তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কথা হলো, ভিক্তরকে তিনি এভাবে দেখতেন। পরে তিনি ভিক্তরের ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে প্যারিসের উপকণ্ঠে এক বাড়িতে গিয়ে ডিনার খেতে যাওয়া শুরু করেন। সিমন কখনো সেখানে যেতে আগ্রহী হননি। তাঁর দু:খ, এভাবে তাঁর ও সার্ত্রের জীবনের একটি অংশ তাঁর কাছে বন্ধ হয়ে গেল।

ইস্টারের ছুটি কাটানোর জন্য এবার তাঁরা খুব চমৎকার একটা ছোট শহর সিরমিয়ন বেছে নিলেন। কেননা, ভেনিসে থেকে যেতে তাঁরা হয়রান হয়ে পড়েছেন। হ্রদের তীরে হোটেল, চারদিকে গড়, বরাবরের মতো সিমন সার্ত্রকে পড়ে শোনান,কাফেতে বসেন, রেস্তোরাঁয় খেতে যান। সিলভি কখনো গাড়িতে তুলে ঘুরিয়ে আনেন। দু'একটি ছোট্ট শহর, যেমন - ভেরন প্রভৃতি ঘুরে তাঁরা প্যারিসে ফিরে এলেন। বড় ছুটির আগে খুব বেশি রাজনৈতিক কর্মকান্ড আর দেখা গেল না। সার্ত্র কয়েকটি প্রতিবাদ-লিপি ছাপালেন। জুনে *ল্য মোঁদ* পত্রিকায় তিনি '৬৮-র ও ঘটনাবৃত্তের অন্যতম নায়ক জর্মন নাগরিক কোহ্ন বেনডিটের ওপর থেকে ফ্রান্সে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞার ১০ বছর হয়ে যাওয়াতে তা তুলে নিতে আহবান জানালেন।

সার্ত্র এসময়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন ভিক্তরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে *ক্ষমতা ও স্বাধীনতা* বিষয়ক গ্রন্থ রচনায়। এটা অনেকটা নতুন ধরনের - মতানৈক্য ও সমর্থন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশিত হবে বলে তাঁর ধারণা।

গ্রীষ্ম এল। সিমন সিলভির সঙ্গে সুইডেন সফর শেষে রোমে এলেন। সার্ত্রের সঙ্গে ছয়টি আনন্দমুখর সপ্তাহ অতিবাহিত করলেন। ফিরে দেখা গেল তাঁর স্বাস্থ্য স্থিতিশীল। ভিক্তরের সঙ্গে আলোচনা আর সিমনের কাছ থেকে গ্রন্থপাঠ শ্রবণ - এই তাঁর রুটিন । বহু নারীর বন্ধুত্ব তাঁকে বরাবর আনন্দ দিয়ে আসছে। মেলিনা এথেন্স চলে গেছেন, স্থান দখলের জন্য মেয়ে লোকের অভাব হলো না। ফ্রঁসোয়াজ সার্গ-র "*জঁ পল সার্ত্রের কাছে প্রেমপত্র*" শীর্ষক রচনা পত্রিকায় প্রকাশের পর সার্ত্র তাঁর সাথে মাঝে মধ্যে মধ্যাহ্ন-ভোজন করছেন। তাঁকে তাঁর বেশ পছন্দ। সিমনের ওপর জোসে দায়ান ও মালকা বিবেসকা যে ছবি নির্মাণ করছিলেন সার্ত্র তাতে অংশগ্রহণ করলেন।

২৮শে অক্টোবর লারজাকের কৃষকদের একটি প্রতিনিধিদল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো। 'আধুনিক সময়ে' তাদের সংগ্রাম সম্পর্কে অনেকগুলো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে । সার্ত্রের এ বিষয়ে খুব আগ্রহ। এদের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত রয়েছে। সার্ত্র এ বিষয়ে একটা ঘোষণাপত্র লিখে দিলেন। লিওঁ শহরের এক অভিনেতা গীওমা একটি প্রকল্প অনুসারে সার্ত্রের রচনা থেকে ইতিহাস ও রাজনীতিকে কেন্দ্র করে একটি নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন । লিওঁ ও ফ্রান্সের সর্বত্র দু'বছর ধরে এটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হতে থাকল।

১৯৭৯

সার্ত্র 'আধুনিক সময়ের' পৃষ্ঠপোষকতায় মার্চ মাসে আয়োজিত ইসরায়েলী ও ফিলিস্তিনীদের একটি সম্মেলনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করছিলেন। মূলত এটি ছিল ভিক্তরের পরিকল্পনা। ইসরায়েল ভ্রমণের পর এলি বেন গালের সঙ্গে তিনি এই বিষয়ে কথাবার্তা বলেছিলেন। প্রকাশক গালিমার খরচ বহন করতে রাজী । সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী

বেশির ভাগই ইসরায়েলের বাশিন্দা। বহু সমস্যা। ১৪ই মার্চ সম্মেলনের উদ্বোধন ঘটল মিশেল ফুকুর বাড়িতে, সার্ত্রের একটা ছোট্ট ভাষণের মাধ্যমে । সার্ত্র , ক্লের এবং সিমন ছাড়া 'আধুনিক সময়ের' কেউ সম্মেলনে আসেননি। সিমনও পরদিন থেকে আর যান নি। ভিক্তরের ব্যাপারে সবাই নাখোশ । জেরুজালেমে বসবাসকারী ফিলিস্তিনী ইব্রাহিম দাহ্কাক বললেন, "এই সংলাপের কোন মানে হয় না । সার্ত্র বুঝতে পারেননি যে, ইসরায়েলে ইসরায়েলী ও ফিলিস্তিনীদের মধ্যে রোজ কথাবার্তা হয় । যেহেতু মিশরীয়, মাগ্রেবী, কাউকে ডাকা হয়নি তাহলে এটাতো জেরুজালেমেই হতে পারতো, সহজে এবং কম খরচে।" আমেরিকা থেকে আগত ফিলিস্তিনী এডওয়ার্ড সাইদ (কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর)-এর কাছে মনে হলো সম্মেলনটি 'তুচ্ছ' এবং আমেরিকা থেকে তাঁকে আনানোর কোন মানে হয় না। সিমন যদিও ভিক্তরের হাবভাবে অসন্তুষ্ট তবু তাঁর মতে, আলোচনা কমবেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ইস্টার উপলক্ষ্যে সার্ত্রসহ সিমন সিলভির গাড়িতে মিদি অঞ্চলে বেড়াতে গেলেন। সার্ত্রের কক্ষে পড়াশোনা ও বাইরে ঘুরে ফিরে ভালো রেস্তোরঁয় আহারকার্য সমাধা- এই কাজ। প্যারিসে ফেরার অল্প পরে এক আধ-পাগলা ব্যক্তি - জেরার দ্য ক্লেভ ছুরি দিয়ে হঠাৎ করে সার্ত্রকে আহত করে। বহুবার সার্ত্র এই লোকটিকে অর্থ সাহায্য করেছেন। সেদিন তাকে ঘরে ঢুকতে দেবেন না আর লোকটি দরোজার ফাঁকে তাঁর আঙুলে দিল ছুরি ঢুকিয়ে । প্রচুর রক্তপাতের পর সার্ত্রকে বেশ ক' দিন ব্যান্ডেজ লাগিয়ে থাকতে হল। আর্লেৎ বাসায় ছিলেন । তিনি পুলিশ ডাকলে জেরারকে ধরে নিয়ে যায়।

২০শে জুন সার্ত্র 'ভিয়েৎনামের জন্য একটি জাহাজ' আন্দোলনের পক্ষে সাংবাদিক সম্মেলনে যোগ দেন লুতেসিয়া হোটেলে। গ্লুকস্মান নিয়ে যান সার্ত্রকে। সেখানে বহুদিন পর সার্ত্র তাঁর সহপাঠী ডানপন্থী রেয়মোঁ আরোঁ-র সঙ্গে করমর্দন করেন। প্রথমে বললেন ফুকু,

তারপর ডা. কুশ্নে, পরে সার্ত্র। আরোঁর বক্তৃতার আগেই তিনি কেটে পড়লেন। ২৬শে জুন তাঁরা সবাই প্রেসিডেন্ট জিস্কারের কাছে 'বোট পিওপল'-দের ত্রাণের উদ্দেশ্যে দাবী নিয়ে গেলেন।

আগস্ট মাসের গ্রীষ্মাবকাশে তাঁরা এক্স-অঁ-প্রোভঁসে গেলেন। চমৎকার পরিবেশ ও খাবার-দাবার। পরে বিমানে তাঁরা এলেন রোম। হোটেলে তাঁরা তাঁদের পছন্দের কামরা দুটি ফিরে পেলেন। সার্ত্র রোমে এক তরুনী মার্কিনির সঙ্গেও খাতির জোটালেন। জর্মন সাংবাদিক আলিস শোয়ার্জের ও অন্যান্য কয়েকজনের সঙ্গে সিমনের সাক্ষাৎ হল। সার্ত্র খুবই উৎফুল্ল এবং প্রাণবন্ত। তিনি *ইউরোপ* পত্রিকার জন্য একটি সাক্ষাৎকার দিলেন কিন্তু খুশি হলেন না ।

ফেরার কিছু পূর্বে প্যারিস থেকে লিলিয়ানের টেলিফোন পেলেন সিমন: গোল্ডম্যান নিহত হয়েছেন। সিমন 'আধুনিক সময়ের' বৈঠকে তাঁর অংশগ্রহণের বড় সমজদার ছিলেন। তাঁর স্নেহধন্য, বুদ্ধিমান ও সুরসিক এক বুদ্ধিজীবী চলে গেলেন। সার্ত্রও খুব বিমর্ষ হলেন। কিন্তু তিনি আজকাল কেমন যেন নিস্পৃহ হয়ে গেছেন। প্যারিসে ফিরে গোল্ডম্যানের শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে তাঁরা যোগ দিতে

পেরেছিলেন ।

সার্ত্র ভিক্তরের সঙ্গে তাঁর কাজ শুরু করলেন । সিমন শংকিত । পরপর তিনদিন তিনি তাঁকে জিগ্যেস করলেন, "আপনার কাজ ভালোভাবে চলছে তো?" প্রথমদিন জবাব দিলেন সার্ত্র, "না" । সারা সকাল দুজনে তর্ক করে কাটালেন, এটা সেটা নিয়ে । পরদিন বললেন, "না, আমরা একমত নই ।"

তৃতীয়দিন বললেন, "আমরা একে অন্যকে শোনার পর্যায়ে এসেছি ।" সিমনের দুর্ভাবনা- সার্ত্র না আবার অনেক ছাড় দিয়ে ফেলেন । সিমন তাঁদের কথোপকথন শুনতে চাইতেন, কিন্তু তা টেপ রেকর্ডারে

গৃহীত হচ্ছিল এবং আর্লেৎ টাইপ করছে নিশ্চিন্তে- খুব ধীরে সুস্থে। "কিছুই এখনো ঠিকমতো দাঁড়ায়নি"- সার্ত্র তাঁকে বললেন।

নভেম্বর মাসে তিনি কাথরিন ক্লেমঁকে একটি সাক্ষাৎকার দিলেন *ল্য ম্যত্যাঁ* পত্রিকার জন্য। ডিসেম্বরে তিনি বের্নার দর-কে এক সাক্ষাৎকার দিলেন থিয়েটার সম্পর্কে, তাঁর ভাবনা চিন্তা ব্যাখ্যা করে । *ত্রাভাই তেয়াত্রাল* সাময়িকীতে প্রকাশিত এই কথোপকথনে তিনি তাঁর প্রিয় নাট্যকার পিরান দেল্লো, ব্রেশট, বেকেট-এর কথা বললেন । তাঁর নিজের নাটক সম্পর্কেও শোনালেন অনেক কিছু।

১৯৮০

জানুয়ারিতে আন্দ্রেই সাখারভকে গৃহবন্দী করে রাখার প্রতিবাদে বিবৃতি দিলেন সার্ত্র এবং মস্কো অলিম্পিক বয়কট সমর্থন করলেন। ২৮শে ফেব্রুয়ারি সমকামীদের মাসিকপত্র *ল্য গে পিয়ে*-তে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার ছাপা হল। তাছাড়া *লার্ক* -এর পরবর্তী সংখ্যার জন্য কাথরিন ক্লেম ও বের্নার প্যাঁজো-র সঙ্গে আলাপচারিতা করলেন।

এর আগে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তাঁর স্বাস্থ্যের চেক-আপ হলে দেখা গেল- তিনি ভালোও না মন্দও না অবস্থায় আছেন। তিনি যথার্থভাবে কাজেকর্মে আগ্রহী, তরুণীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তাঁকে বিনোদনের ভাগী করত কেবল। সব মিলিয়ে তিনি আনন্দিত জীবন যাপন করছেন। শীতের এক সকালে তাঁর পড়ার ঘরে তাঁর মুখমন্ডল রৌদ্রস্নাত হলে তিনি উল্লাসের সঙ্গে বলে উঠলেন, "আহ্ রোদ!" সিলভির সঙ্গে তাঁর বেল-ইল যাবার কথা ইস্টারে। খুশি মনে তিনি এর কথা প্রায় বলতেন। শরীরের প্রতি যত্ন নিয়ে ইদানীং তিনি ধুমপান বন্ধ করেছেন এবং সিমনের জানা মতে, এলকোহল পান করছেন খুব অল্প পরিমাণে । দুপুরে খাবার সময় একটা হাফ বোতল শাবলি নিলেও বেশ কিছু রেখে দিতেন।

তবু এক রোববার সকালে আর্লেৎ তাঁকে শুয়ে থাকতে দেখলেন কার্পেটে। মুখের চেহারা বিকট । জানা গেল, তাঁর বান্ধবীরা বিপদের কথা না জেনে এনেছিল হুইস্কি ও ভদকা । পানের পর তিনি সেগুলো বইয়ের পেছনে লুকিয়ে রেখেছেন । শনিবার সন্ধ্যায় ওয়ঁদা চলে গিয়েছিল বলে একা থাকাতে তিনি মাতাল হয়ে গেলেন। আর্লেৎ ও সিমন লুকিয়ে রাখার জায়গা খালি করলেন । সিমন সার্ত্রের বান্ধবীদের ফোন করে আর কখনো মদ-টদ না আনতে বলে দিলেন । সার্ত্রকেও তিনি আচ্ছা করে বকুনি দিলেন।

তাৎক্ষণিক কোন স্বাস্থ্যগত সমস্যার সৃষ্টি না হলেও ভবিষ্যতের কথা ভেবে সিমন একটু চিন্তিত হলেন। সার্ত্র আবার মদ্যাসক্ত হয়ে পড়বেন বলে তাঁর ভয়। তাঁর প্রশ্নোত্তরে সার্ত্র বললেন, "আপনিও তো পান করতে ভালোবাসেন !" . .

সিমন লক্ষ্য করলেন, সার্ত্র এখন আর ভিক্তুরের সঙ্গে কথোপকথনে খুশি নন। *ল্য নুভেল অবজেরভাত্যার* -এ সার্ত্র এবং বেনি লেভি (যা ভিক্তুরের আসল নাম)-র কথোপকথন ছাপা হবার আটদিন আগে সিমন সে সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন।

তিনি তখন দেখলেন যে, এতে সার্ত্র যাকে বলেন 'বহুবচনে চিন্তা' তার ধারে কাছেও নেই । ভিক্তুর তাঁর মতামত প্রকাশ্যে বলছেন না। অথচ সার্ত্রকে দিয়ে যেন বলাচ্ছেন। সার্ত্রের কাছ থেকে সে অধিকারও যেন তিনি পেয়ে গেছেন। তাঁর রাগী উচ্চমন্যতা বন্ধুদের বিদ্রোহী করে তুলল । বাস্তবিকই, সার্ত্রের সঙ্গে যখন পরিচয় তখনকার থেকে এখনকার ভিক্তুর যেন অনেক পরিবর্তিত। অনেক পুরনো মাওবাদীর মতো এখন তিনি ঝুঁকেছেন ঈশ্বর অভিমুখে। ইসরায়েলের ঈশ্বর- যেহেতু তিনি ছিলেন ইহুদী, তাঁর বিশ্ববীক্ষা হয়ে পড়লো অধ্যাত্মবাদী, এমনকি ধর্মীয়। এই নতুন পরিপ্রেক্ষিতে সিলভি ও সিমনের কাছে এক সন্ধ্যায় সার্ত্র নাকি সুরে তিরস্কারের ভাষা ব্যবহার করে তাঁর বিরক্তি

প্রকাশ করলেন: "ভিক্তর সর্বতোভাবে চান যে নৈতিকতার সব তাৎপর্য যেন *তোরা*- তে রয়েছে। কিন্তু আমি আদৌ তা মনে করি না।" ভিক্তর কোথায় তাঁকে সাহায্য করবে তাঁর চিন্তাধারাকে সমৃদ্ধ করে তুলতে, বরং তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন যেন তিনি তা অস্বীকার করেন। কোন্ সাহসে তিনি ধারণা করলেন যে, সার্ত্রের দুর্ভাবনা আসলে তাঁর কর্মপদ্ধতির একটা অংশ । বস্তুতপক্ষে সার্ত্র কখনো এসব নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন না। কিছু সমালোচনা তিনি অবশ্যই শুনতে চান, তবে একেবারে ঘোরতর বিপরীত মতবাদ তো গ্রহণ করতে পারেন না । কী করে যে-ভ্রাতৃত্বের ধারণা রয়েছে *ক্রিত্রিক দালা রেঁজো দিয়লেক্‌তিকে* এতো দৃঢ়, এত অনড় অবস্থানে, তাকে অগ্রাহ্য করা। সার্ত্রকে সিমন তাঁর হতাশার কথা জানালেন । সার্ত্র আশ্চর্য হলেন। সিমন তাঁর সঙ্গে 'আধুনিক সময়ের' সবাই যে একমত তাও বললেন। কিন্তু তিনি লেখাটা যাতে দ্রুত ছাপা হয় সে চিন্তায় বদ্ধ-পরিকর থাকলেন। অলিভিয়ে তদ-এর ভাষায় যাকে বলে, "বুড়োর ভীমরতি", তাই কি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে ?

সার্ত্র সবসময় নিজের বিরুদ্ধে ভাবতে পছন্দ করেন । কিন্তু সেটা কোন সহজীকরণে পতিত হবার বিষয় নয় । এই অস্পষ্ট এবং দুর্বল দর্শন ভিক্তর ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করেছিলেন। কেন তিনি এর মধ্যে ছিলেন যিনি কখনো কোন প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন না? তিনি কেন ভিক্তরের দ্বারা প্রভাবিত হবেন? তিনি ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন, কেন? এটা গবেষণা করবার মতো বিষয় বটে! সার্ত্র সবসময় ভবিষ্যতের আশায় জীবনপাত করেছেন। সার্ত্রের মৃত্যুর পর একটি টিভি অনুষ্ঠানে ভিক্তরের মুখোমুখি রেয়মোঁ আরোঁ খুবই সুন্দর-ভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন।

"দ্বাররুদ্ধ" নাটকের একটি সংলাপ : "আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়ি "(গারস্যাঁ)। তিনি অন্যভাবে বেঁচে থাকতে পারতেন না। বর্তমান পরিস্থিতিতে নিজেকে তিনি মৃতই ভাবতেন ।

হতাশার মুহূর্তে তিনি নিজেকে 'জ্যান্ত-মরা' বিবেচনা করতেন। বয়স্ক, অশক্ত শরীর, আর অর্ধ-অন্ধ সার্ত্র ! ভবিষ্যত তাঁর কাছে বন্ধ হয়ে আসছে । তাই তিনি একজন *ঘোরতর* সংগ্রামী ও দার্শনিক ভিক্তরের কাছে আত্মসমর্পন করেছিলেন। সার্ত্রের স্বপ্নের "নব্য বুদ্ধিজীবী" বলতে ভিক্তরকেই যেন তিনি দেখতে পেতেন। এখন তাঁকে অস্বীকার করা মানে নিজের প্রলম্বিত সত্তাকে অস্বীকার করা। পরবর্তী প্রজন্মের সমর্থন তাঁর কাছে নিজের চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ । বিরুদ্ধ ভাবনা সত্ত্বেও তিনি তাঁকে বিশ্বাস করতে পছন্দ করতেন। ভিক্তর ছিলেন কথার রাজা , সার্ত্রকে ভেবে-চিন্তে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় দিতেন না। সিমনের ধারণা, আরেকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো : সার্ত্র পড়তে পারছেন না। পুনর্পাঠে সক্ষম হচ্ছেন না । নিজের চোখে না দেখে সিমন কোন লেখা বিচার করতে অক্ষম। সার্ত্রও তাই ছিলেন। এখন শুধু কান দিয়ে 'কনট্রোল' করছেন। অন্য পক্ষে আর্লেৎও ভিক্তরকে সমর্থন করছেন। কিন্তু তিনি সার্ত্রীয় দর্শনের কিছুই জানেন না। ভিক্তরের সঙ্গে তিনি ইদানীং হিব্রু শিখছেন। যাহোক, সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হলে সার্ত্র বিস্মিত ও ব্যথিত হলেন যখন জানলেন যে, তাঁর সব শিষ্য, বিশেষ করে তাঁর বন্ধুরা সিমনের আতঙ্কের সঙ্গে একমত।

বুধবার ১৯শে মার্চ বোস্ত এর সঙ্গে তাঁরা এক চমৎকার সন্ধ্যা অতিবাহিত করলেন । ঘুমোনোর আগে সার্ত্র সিমনকে জিগ্যেস করলেন: "আজ সকালে 'আধুনিক সময়ের' বৈঠকে কেউ কি ইন্টারভিউটি নিয়ে কথা বলেছিল?" সিমন যা সত্য তাই বললেন, "না"। সার্ত্র একটু হতাশ হলেন। বহু আশা করেছিলেন যে , তাঁর কিছু সমর্থক তিনি অবশ্যই পাবেন!

২০শে মার্চ সকালে সার্ত্রকে অসুস্থ দেখা গেল । এদিকে সার্ত্রের সেক্রেটারী পুইগ বিল না দেওয়ায় টেলিফোনের লাইন কাটা ছিল। সিমন নিচে গিয়ে কোঁসিয়ের্জের ঘর থেকে ফোন করে একজন ডাক্তার

ডেকে আনালেন। এ্যাম্বুলেন্স তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেল এবং নানাভাবে তাঁর চিকিৎসা চলতে লাগল। সিমন যখন দেখতে গেলেন তখন শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিত হয়ে এসেছে। তিনি ভালোই আছেন, বললেন।

পরদিন বিকেলে ডাক্তাররা সিমনকে বললেন, সার্ত্রের ফুসফুস স্ফীত হয়েছে যার ফলে তাঁর জ্বর হচ্ছে কিন্তু তা দ্রুত সেরে যাবে। তিনি একটু আবোল তাবোল বকলেন। পরবর্তী ক' দিনের মধ্যে তাঁর জ্বর পড়ে গেল । ধমনী ঠিকমতো কাজ করছে না । কিন্তু রক্ত চলাচল ঠিক হয়ে এল। তাঁরা প্যারিসের বাইরে যাবার কথা ভাবছেন। সার্ত্র খুশি: ইদানীং যা ঘটে গেছে তা নিয়ে আর ভাবতে হবে না। একজনের বেশি তাঁকে দেখতে যাওয়া যায় না । তাই সকালে আর্লেৎ আর বিকেলে সিমন যেতেন। সকালে ফোন করলে সিমন জানতেন যে ভালোই কেটেছে সে রাত। দুপুরে খেয়ে একটু নিদ্রা, পরে একটা চেয়ারে বসে জীর্ণ শীর্ণ সার্ত্র সিমনের মুখোমুখি কিন্তু মন-মানসিকতা খুবই উত্তম। সন্ধ্যা ছ' টায় আর্লেৎ তাঁকে ডিনার খেতে সাহায্য করেন। কখনো ভিক্তরও আসতেন।আরো ক' দিন পর সিমন ডাক্তারকে সার্ত্র কখন বেরুতে পারবেন জিগ্যেস করলে, তাঁর ইতস্তত জবাব : "আমি বলতে পারি না। তিনি দুর্বল, খুবই দুর্বল।"

এদিকে সার্ত্র ভাবলেন, বেরিয়েই তাঁরা বেল-ইল ভ্রমণে যাবেন, কিন্তু ইতোমধ্যে সিমন হোটেল রিজার্ভেশান ক্যান্সেল করেছেন । ডাক্তার বলে দিয়েছে, তাঁকে হাতের নাগালে রাখতে হবে। ভীষণ ক্লান্তি ছাড়াও তাঁর গ্যাংগ্রিন শুরু হয়েছে । মূত্রাশয় ঠিকমত কাজ করছে না । যদিও তাঁর এখন দাঁড়ানো খুব একটা হচ্ছে না, তবু প্রস্রাব নিষ্কাস্তের জন্য তাঁকে প্লাস্টিকের ব্যাগ বহন করতে হচ্ছে। সিমন ডাক্তারদের নিজেদের মধ্যে আলোচনায় 'ইউরেমি' কথাটা শুনতে পেলেন। তিনি বুঝলেন, সার্ত্রের কোন আশা নেই । তিনি জানতেন, 'ইউরেমির' ফলে ভয়ানক

কষ্ট পেতে হয় । তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে ডাক্তার উস্সের বাহুতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন, "ডাক্তার, প্রতিজ্ঞা করুন -সার্ত্র যেন তাঁর মৃত্যু দেখতে না পান। তিনি যেন কষ্টে কোঁকাতে না থাকেন।" "আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, মাদাম ।" একটু পর করিডোরে তাঁকে ডাকলেন ডাক্তার এবং বললেন: "আপনাকে আবার বলতে চাচ্ছি যে, কথা যখন দিয়েছি সেটা বাতাসে উড়িয়ে দেবার জন্য নয় । আমি কথা রাখব।"

সার্ত্রের কিডনী ঠিকমত কাজ করছে না । তখনও তাঁর প্রস্রাব হচ্ছে । কিন্তু ইউরিয়া ছাড়া । একটা অপারেশান দরকার । কিন্তু তিনি সেটা সহ্য করতে পারবেন না। পরে দেখা গেল ব্রেইনে রক্ত চলাচল হচ্ছে না ঠিকমত । এখন তাঁকে শান্তিতে মরতে দেওয়া ছাড়া অন্য কোন সমাধান নেই ।

পরবর্তী ক' দিন তেমন কোন কষ্ট পান নি সার্ত্র । "কিছু সময় একটু অস্বস্তিকর অবস্থায় কেটেছে সকালে কেউ যখন গ্যাংগ্রিন পরিষ্কার করে"- সিমনকে বললেন তিনি। রক্ত চলাচলের অভাবে চামড়ায় গ্যাংগ্রিনের বিস্তার।

অনেক ঘুম তাঁর। সিমনের সঙ্গে আস্তে আস্তে কথা বলছেন। কখনো মনে করছেন - তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন । এর মধ্যে একদিন তিনি সিমনকে জিগ্যেস করলেন: "দাফনের খরচ মেটানো হবে কীভাবে ?" সিমন প্রতিবাদ করলেন। শুধু জানালেন, হাসপাতালের খরচ সোস্যাল সিকিউরিটি থেকে আসবে । কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন যে, সার্ত্রও তাঁর অন্তিম অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পেয়ে গেছেন । তবে তাতে তিনি শংকিত নন। শেষ ক' বছরের অর্থাভাব তাঁকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছে । পরদিন তিনি সিমনের কব্জিতে হাত রাখলেন এবং বললেন : "আমি আপনাকে খুবই ভালোবাসি, আমার ছোট্ট কাস্তর।"

১৪ই এপ্রিল, যখন সিমন এলেন তখন সার্ত্র ঘুমোচ্ছিলেন । জেগে উঠে, চোখ না খুলে কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করলেন। তারপর ঠোঁট

বাড়িয়ে দিলেন। সিমন তাঁর ওষ্ঠে, তাঁর গন্ডে চুমু খেলেন । আবার ঘুমিয়ে পড়লেন সার্ত্র । প্রকাশ্যত তাঁর দিক থেকে অস্বাভাবিক এই উচ্চারণ ও আচরণ যেন মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিত চিহ্নিত করে গেল ।

কয়েকমাস পর প্রফেসর উস্‌সের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সিমনকে তিনি বললেন, সার্ত্র তাঁকে প্রায়ই প্রশ্ন করতেন যে, "এসবের শেষ কোথায় ? আমার কী হবে ?" মৃত্যু তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ ছিল না । ব্রেইন নিয়েই তাঁর দুর্ভাবনা । মৃত্যুর ব্যাপারটা তিনি আগেই আন্দাজ করতে পেরেছেন । তিনি ছিলেন "মুক্ত পক্ষ", উস্‌সের বক্তব্য । সম্ভবত তাঁকে যে ঔষধ দেয়া হয়েছে তার ফলে এই প্রশান্তির কারণ ঘটেছে । প্রথম দিকের অর্ধ-অন্ধত্বের ব্যাপার ছাড়া তিনি সবসময় শান্তভাবে সব কিছু সহ্য করে গেছেন। তাঁর নিজের বিরক্তিকর পরিস্থিতি নিয়ে তিনি অন্যদের বিব্রত করতে চাননি । যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কিছু করা যাবে না তা করতে যাওয়া অনর্থক । কোঁতাকে তিনি বলেছিলেন, "এটা এরকমই, আমার কিছু করার নেই । আমার হতাশ হবার কোন কারণ নেই ।" তিনি এখনও ভীষণভাবে জীবন ভালোবাসেন কিন্তু মৃত্যু-ভাবনা যাকে তিনি আশি বছরে ঠেলে দিয়েছেন ,তাও তাঁর পরিচিত, কোন ঝামেলা ছাড়া তিনি তার আগমনকে গ্রহণ করতে রাজি । কেননা তাঁকে ঘিরে যে স্নেহ, মমতা, বন্ধুত্ব এবং তা তাঁর অতীতকে ভরে দিয়েছে সন্তুষ্টিতে: "যা করার ছিল তাতো করা হয়েছে ।"

উস্‌সে আরো বলছিলেন যে, যে অস্বস্তিকর অবস্থা তাঁর হয়েছে তাতে তাঁর স্বাস্থ্যের ওপর তেমন প্রভাব বিস্তার করেনি। ইমোশনগত সংকট তক্ষুনি মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারত কিন্তু সময়ের বিবর্তনে পরিবর্তন ঘটে গেছে । দুশ্চিন্তা, নিরানন্দ - কিছুই না, যা তাঁর রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া করছিল। তবে তা খুব সত্বর অনেক খারাপ আকার ধারণ করতে পারতো। দু-বছরের মধ্যে ব্রেইনে ধরে সার্ত্র যা ছিলেন তা আর থাকতেন না ।

১৫ই এপ্রিল মঙ্গলবার সকালে অভ্যাসমত সিমন ফোন করে জানতে চাইলেন - সার্ত্র ভলোভাবে ঘুমিয়ে ছিলেন কিনা । নার্স তাঁকে জবাব দিলেন, হ্যাঁ, কিন্তু ... সিমন সঙ্গে সঙ্গে রওনা দিলেন। সার্ত্রকে তিনি সজোরে শ্বাস টেনে ঘুমুতে দেখলেন। দৃশ্যত তিনি তখন কমাতে । পূর্ব সন্ধ্যা থেকে এই অবস্থা । ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি তাঁকে দেখতে লাগলেন । সন্ধ্যা ছ' টার দিকে আর্লেৎকে জায়গা ছেড়ে তিনি ফিরে চললেন এবং কিছু ঘটলে ফোন করতে বললেন । ৯টার সময় টেলিফোন বাজল । আর্লেৎ বললেন : " তা থেমে গেছে তো।" সিলভিকে নিয়ে সিমন এলেন। তিনি আছেন তাঁর মতো, শুধু শ্বাস- প্রশ্বাস নেই ।

সিলভি, লঁজমান, বোস্ত, পুইগ, অর্স্তকে জানালে ওঁরা দৌড়ে এসে গেলেন। সকাল পাঁচটা পর্যন্ত তাঁদের সার্ত্রের কক্ষে থাকতে দেয়া হলো। সিমন সিলভিকে হুইস্কি নিয়ে আসতে বললেন। সার্ত্রের শেষ দিনগুলোর সম্পর্কে কথা বলে তাঁরা পান করতে লাগলেন। সার্ত্র সিমনকে প্রায়ই বলতেন যে, তিনি তাঁর মা ও সৎ পিতার মধ্য-খানে পেরলাশেজ- এ কবরস্থ হতে চান না । তিনি ভস্মীভূত হতে চেয়েছেন। তাই তাঁকে মোপারনাসের কবরস্থানে সাময়িকভাবে দাফনের ব্যবস্থা করা হলো । ওখান থেকে পরে পেরলাশেজে দাহের জন্য নেওয়া হবে । তাঁর দেহভস্ম মোপারনাসের কবরস্থানে নির্দিষ্ট কবরে রক্ষিত হবে । ওঁরা যখন ভেতরে ছিলেন, সাংবাদিকরা চারদিক ঘিরে ফেলছিলো। বোস্ত ও লঁজমান তাঁদেরকে স্থান ত্যাগ করতে বললেন। ওঁরা লুকিয়ে থাকলেন । হাসপাতালে আনার সময়েও ওঁরা ফটো তুলতে চেয়েছেন। দু জন নার্সের পোশাক পড়ে কক্ষেও ঢুকে পড়ে ছিলেন। কিন্তু তাঁদের তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে নার্সরা খুব সাহায্য করেছিলো । তবু সম্ভবত পাশের কোনো বাড়ির ছাদ থেকে তোলা ঘুমন্ত সার্ত্রের তোলা ছবি *পারী-ম্যাচ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

এক সময় সিমন চাইলেন তাঁকে সার্ত্রের সাথে একলা থাকতে দেয়া হোক। তাই হলো। চাদরের নিচে তিনি ঢুকে পড়তে চেয়েছিলেন ।

কিন্তু নার্স তাঁকে বাধা দিলেন : "না, সাবধান, গ্যাংগ্রিন।" তখনই সিমন তাঁর গ্যাংগ্রিনের প্রকৃতি বুঝতে সক্ষম হলেন । তিনি চাদরের ওপর শুলেন । একটু ঘুমুলেনও । ৫টার সময় নার্সরা এলেন । তাঁরা সার্ত্রের মরদেহের ওপর একটি চাদর ও এক ধরনের ঢাকনি দিয়ে তাঁকে ঢাকলেন এবং একটু পর তাঁকে নিয়ে চলে গেলেন । বাকি রাত সিমন লঁজমানের বাড়িতে কাটালেন । বুধবারও থাকলেন সেখানে । পরবর্তী দিনগুলো সিলভির বাসায় । এভাবে টেলিফোন এবং সাংবাদিকদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করলেন সিমন । এরমধ্যে আলজাস থেকে এলেন তাঁর বোন। এলেন বন্ধুরা । পত্রপত্রিকা ও অগুণতি তারবার্তার ওপর একবার চোখ বুলালেন । লঁজমান, বোস্ত ও সিলভি আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে ব্যস্ত রইলেন । দাফন প্রথমে শুক্রবার, পরে অধিক লোকজনের অংশগ্রহণের সুবিধার্থে শনিবার ঠিক হলো । জিস্কার দেস্ত্যাঁ বলে পাঠালেন যে, তিনি জানেন - সার্ত্র জাতীয় শেষকৃত্যানুষ্ঠান পছন্দ করতেন না তাই অন্তত দাফনের খরচপত্র বহনের প্রস্তাব দিলেন। সিমনরা তা প্রত্যাখ্যান করলেন। জিস্কার সার্ত্রের মরদেহের সামনে এসে নীরবে শ্রদ্ধা নিবেদন করে চলে গেলেন।

শুক্রবার বোস্ত এর সঙ্গে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর সিমন দাফনের আগে একবার সার্ত্রকে দেখতে চাইলেন সার্ত্রকে তখন স্যুট পরানো হয়েছে যা সিলভি অপেরা দেখার জন্য কিনে দেন । সিমনের ঘরে এটাই একমাত্র স্যুট। অন্যকিছু খোঁজার জন্য সিলভি সার্ত্রের ঘরে যেতে চাইলেন না । সার্ত্র ছিলেন প্রশান্ত, সব মৃতের মতো । এবং তাদের বেশির ভাগের মতোই ভাবলেশহীন।

শনিবার সকালবেলা তাঁরা এলেন হল ঘরে যেখানে সার্ত্রকে রাখা হয়েছে। খোলা মুখমন্ডল তাঁর সুন্দর পোশাকে শক্ত এবং ঠান্ডা, সিমনের অনুরোধক্রমে প্যাঁগো ৪টা ছবি তুললেন । বেশ কিছুক্ষণ পর তাঁর মুখ ঢেকে দেয়া হল । লাশের বাক্সে বন্ধ করে তাঁকে নিয়ে গেল ।

সিমন লাশের গাড়িতে উঠলেন - সিলভি, তাঁর বোন ও আর্লেৎসহ। তাঁদের সামনে একটা গাড়ি যাতে বহু ফুলের মালা আর মৃতের জন্য পুষ্প-মুকুট । একটা মিনিবাসে বৃদ্ধ ও অসচ্ছল ব্যক্তিরা

রয়েছেন । জনতার ঢল : প্রায় ৫০,০০০ লোক । বেশির ভাগ কম বয়সী, ধীর পদক্ষেপে এগোচ্ছেন। 'আধুনিক সময়ের' লোকেরা একটা ব্যূহ নির্মাণ করে রেখেছেন । এবং তাঁদের সঙ্গে আরো অনেকে স্বত:স্ফূর্তভাবে সাহায্য করছেন । সর্বতোভাবে সমস্ত শোক মিছিল ছিল উষ্ণ ও সুশৃংখল । লঁজমান বললেন : এটা হলো '৬৮-র আন্দোলনের শেষ মিছিল । সিমন কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছেন না । তিনি ভ্যালিয়াম খেয়ে প্রায় আধা-বেহুঁশ । কেবল স্বগতোক্তি করলেন : "সার্ত্র যা

চেয়েছিলেন ঠিক সেরকম শেষকৃত্যই হতে যাচ্ছে । কিন্তু তিনি তা জানবেন না ।" তিনি যখন গাড়ি থেকে নামছেন তখন সার্ত্রের দেহাবশেষ কবরে নামানো হয়ে গেছে । সিমন একটি চেয়ার চাইলেন এবং সেখানে বসে থাকলেন ভাবলেশহীন। যখন তিনি উঠলেন তখনও খুব ভীড়, দশ মিটার দূরে গাড়িতে উঠতে গেলেও বহু সময় লাগলো । ভীড় ঠেলে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় তিনি বন্ধুদের সঙ্গে লঁজমানের বাড়ি ফিরে এলেন । ...বন্ধুরা কেউ এক অন্যকে ছেড়ে থাকতে চাইলেন না ।

সন্ধ্যায় তাঁরা একত্রে জেইয়ের ওখানে নৈশ-ভোজন করলেন । সিমনের আর কিছুই মনে নেই। তিনি বোধহয় একটু বেশি পান করেছিলেন। তাঁকে সিঁড়িতে ধরে ধরে নামাতে হয়েছিল। এক বন্ধু তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল । পরবর্তী তিনদিন তিনি সিলভির বাড়িতে থাকলেন । বুধবার সকালে পেরলাশেজ-এ সার্ত্রের দাহ-কার্য সম্পন্ন হল । ক্লান্তির কারণে সিমন সেখানে গেলেন না । এক পর্যায়ে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় তিনি বিছানা থেকে পড়ে গেলেন । সিলভি ও লঁজমান যখন দাহ শেষ করে ফিরে এলেন তখনও তিনি কার্পেটের ওপর বসা এবং বিড়বিড় করছেন। তাঁরা তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন । দু'সপ্তাহ পর সুস্থ হলেন সিমন ।

সার্ত্রের দেহভস্ম মোপারনাসের কবরস্থানে নিয়ে আসা হল । প্রতিদিন অপরিচিত লোকজন তাঁর কবরে তাজা ফুলের ছোট্ট তোড়া দিয়ে যেতে লাগল ।

কাহিনীর উপসংহারে এসে সিমন লিখেছেন :

"একটি প্রশ্ন আছে যা সত্যি সত্যি আমি কখনো নিজেকে করিনি। পাঠক হয়তো সে প্রশ্ন করবেন । সার্ত্রের আসন্ন মৃত্যু সম্পর্কে আমার কি তাঁকে অবহিত করা উচিত ছিল না ? হাসপাতালে তাঁকে দুর্বল অবস্থায় দু:সংবাদ জানানোর কথা ভেবেছি । আগে তিনি আমাকে সবসময় বলেছেন যে ক্যান্সার বা অন্য কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে তিনি যেন জানতে পারেন। কিন্তু তাঁর অবস্থা ছিল দোদুল্যমান । তিনি ছিলেন "বিপদগ্রস্ত" । তিনি কি আরো দশবছর টিকবেন যা তিনি চান, নাকি সব শেষ হয়ে যাবে দু-এক বছরে? কেউ কিছু বলতে পারে না । তাঁর বিশেষ কিছু করারও তো নেই, তাঁর জন্য যা দেওয়া হয়েছে তাঁর থেকে ভালো চিকিৎসা পাওয়া সম্ভব ছিল না । আর তিনি জীবন ভালোবাসতেন । ইতোমধ্যে তাঁর অর্ধ-অন্ধত্ব, তাঁর অসুস্থতা তাঁকে অসুবিধায় ফেলে দিয়েছিল । তাঁর ওপর যে বিপদ ঘনিয়ে আসছিল সে সম্পর্কে বেশি জেনে অকারণ তাঁর শেষ বছরগুলো আরো অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়তো।"

সব মিলিয়ে সার্ত্রের মতো সিমনও দুশ্চিন্তা এবং আশা-নিরাশার মধ্যে দোদুল্যমান ছিলেন । তাঁর নিস্তব্ধতা তাঁদের দুজনকে আলাদা করে দেয়নি ।

তাঁর মৃত্যু তাঁদের আলাদা করেছে । সিমনের মৃত্যুও তাঁদেরকে আর একত্র করবে না। এটা এরকমই । তাঁদের জীবন যে এত দীর্ঘকাল সঙ্গতিপূর্ণ থাকতে পেরেছে তাই ইতোমধ্যে সুন্দরের প্রতীক হয়ে রইল।

ছোট বোনের সঙ্গে সিমন

সিমন (ডানে) ও তাঁর বন্ধু জাজা (মাঝখানে)

সার্ত্রের সঙ্গে- তিরিশের দশকে

সার্ত্র ও সিমন একটি বেতার অনুষ্ঠানে (৪০ -এর দশকের শেষদিকে)

সিমন ও সার্ত্র (৫০ -এর দশকের শেষদিকে)

সার্ত্র ও সিমনের নিষিদ্ধ পত্রিকা বিক্রি (৭০ -এর দশকে)

কাফে দ্য ফ্ল্যরে বসে লিখছেন

নিজের স্টুডিওতে- শেষ বয়সে

লঁজমান ও সিমন

দুই বয়সে সিমন

সিমন, সার্ত্র ও সিলভি (৭০ -এর দশকের শেষদিকে)

সিমন ও সার্ত্র -এর কবর

ড. কোরেশী কর্তৃক মে ১৯৬৮ সালে প্যারিসের সর্বন এলাকায় তোলা ৪টি ছবি

সর্বনের দেয়ালে মাও-এর ছবি; সামনে নিগ্রো ছাত্রদের সমাবেশ

মেট্রো স্টেশন: স্যাঁ জের্মাঁ দে প্রে: রবিশঙ্করের সংগীতানুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন- বোর্ড

কাছে পথচিত্র এঁকে ছাত্র শিল্পীর অর্থ সংগ্রহের দৃশ্য

গালিমার প্রকাশিত সিমনের বই

Romans

L'INVITÉE (1943). Folio nº 768.

LE SANG DES AUTRES (1945). Folio nº 363.

TOUS LES HOMMES SONT MORTELS (1946). Folio nº 533.

LES MANDARINS (1954). Folio nºˢ 769 et 770.

LES BELLES IMAGES (1966). Folio nº 243.

QUAND PRIME LE SPIRITUEL (1979).

Récit

UNE MORT TRÈS DOUCE (1964). Folio nº 137.

Nouvelles

LA FEMME ROMPUE, suivi de MONOLOGUE et de L'ÂGE DE LA DISCRÉTION (1968). Folio nº 960.

Théâtre

LES BOUCHES INUTILES (1945).

Essais-Littérature

PYRRHUS ET CINÉAS (1944).

POUR UNE MORALE DE L'AMBIGUÏTÉ (1947).

L'AMÉRIQUE AU JOUR LE JOUR (1948). Folio nº 2943.

LE DEUXIÈME SEXE, I et II (1949). Folio Essais nºˢ 37 et 38.

PRIVILÈGES (1955). Repris dans la collection « Idées » sous le titre FAUT-IL BRÛLER SADE ?

LA LONGUE MARCHE, *essai sur la Chine* (1957).

MÉMOIRES D'UNE JEUNE FILLE RANGÉE (1958). Folio n° 786.

LA FORCE DE L'ÂGE (1960). Folio n° 1782.

LA FORCE DES CHOSES (1963). Folio nos 764 et 765.

LA VIEILLESSE (1970).

TOUT COMPTE FAIT (1972). Folio n° 1022.

LES ÉCRITS DE SIMONE DE BEAUVOIR (1979), par Claude Francis et Fernande Gonthier.

LA CÉRÉMONIE DES ADIEUX, *suivi de* ENTRETIENS AVEC JEAN-PAUL SARTRE, août-septembre 1974 (1981). Folio n° 1805.

LETTRES À SARTRE. *Édition présentée, établie et annotée par Sylvie Le Bon de Beauvoir.*

I. 1930-1939.

II. 1940-1963.

UN AMOUR TRANSATLANTIQUE (LETTRES À NELSON ALGREN, 1947-1964). *Texte établi, traduit de l'anglais et annoté par Sylvie Le Bon de Beauvoir.*

Témoignage

DJAMILA BOUPACHA (1962), en collaboration avec Gisèle Halimi.

Scénario

SIMONE DE BEAUVOIR (1979), un film de Josée Dayan et Malka Ribowska, réalisé par Josée Dayan.

আহমদ পাবলিশিং হাউস
ঢাকা